1961

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা

১৩৬৮

093.7
P.926

093.7/P.926

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা

সম্পাদক
শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী

আশ্বিন ১৩৬৮

সেপ্টেম্বর ১৯৬১

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য (সভাপতি)

" শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

" শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদক)

শ্রীঅসীম চট্টোপাধ্যায় (কর্মসচিব)

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	অধ্যক্ষ সনৎকুমার বসু	
॥ সংকলন ॥		
অস্তরবির আলো শতদল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
বিশ্বভারতী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ[১]	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ[২]	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
ছন্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
জগদীশ-প্রশস্তি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮
মানুষ রবীন্দ্রনাথ	চারুচন্দ্র দত্ত	২০
রবীন্দ্রনাথ	হুমায়ুন কবির	২৯
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে	রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩১
ছাত্রসমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব	ভূপতিমোহন সেন	৩৩
জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৮
শান্তিনিকেতন	প্রবাসজীবন চৌধুরী	৪৬
আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৪
চির-চিহ্ন	নির্মলকান্তি মজুমদার	৫৭
রবীন্দ্র-উপন্যাস : স্বগত চিন্তা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৬২
রবীন্দ্র-নাটক পাঠের ভূমিকা	ভোলানাথ ঘোষ	৬৬
রবীন্দ্রনাথের মন	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	৭৭
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী	ভবতোষ দত্ত	৮২
"পুনশ্চ"র কবি রবীন্দ্রনাথ	সুলেখা দে	৯০
মৃত্যুমাঝে, অশ্রুমাঝে···	শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৯৫
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা	রাখালচন্দ্র নাথ	৯৬
'কথার ফড়িং ঝাঁপায়'	হরপ্রসাদ মিত্র	১০৩
'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'	(সম্পাদকীয়)	১০৭
আমাদের রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসব		১১৪
Prantik : Poem No, 14	Rabindranath Tagore	1
The Philosophic Legacy of Rabindranath Tagore	Dr. Sarojkumar Das	2
Tajmahal	Somenath Maitra	10
Some Contacts with Rabindranath	Debendramohan Bose	12
Wild Swans	Lalitmohan Chatterjee	17
Urvasi	Lalitmohan Chatterjee	18
Rabindranath's Mysticism	Paresnath Bhattacharyya	21
Obituary		35

মুখবন্ধ

আজ থেকে শতবর্ষ আগে বাঙালীর ইতিহাসের এক পরম শুভলগ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বর্তমান বৎসরে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে অন্যান্য বহু দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ও হবে। এক বিস্ময়কর সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন—লোকোত্তর এক প্রতিভা যা জাতি-দেশ-কালের অতীত। তিনি বাংলারও যেমন গৌরব, বিশ্বেরও তেমনি বরেণ্য। এই পুরুষোত্তম মনীষী ও কবিশ্রেষ্ঠকে এক দিনের জন্য প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে বহিরঙ্গ ছাত্র হিসেবে পেয়ে এই বিদ্যায়তন একদা ধন্য হয়েছিল। ৫ই ফাল্গুন ১৩৪৩ সনে এই বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সভায় প্রদত্ত অভিভাষণে কবি স্বয়ং এই তথ্যটি প্রকাশ করেছিলেন। মাত্র এক দিনের জন্য হলেও, একসময়ে তিনি যে এখানে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন তা' প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে নিশ্চয়ই এক স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তীকালে একাধিকবার বিভিন্ন উপলক্ষে এই বিদ্যায়তনে তাঁর শুভাগমন ঘটেছে এবং এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের তাঁর অপূর্ব আবৃত্তি ও ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। একাধিকবার এই পত্রিকার অনুরোধক্রমে স্বহস্তলিখিত কবিতা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সংখ্যাটি কলেজ পত্রিকার রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। শুভ শতবার্ষিকী বৎসরে এক মহান্ স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হ'লো।

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

সনৎকুমার বসু

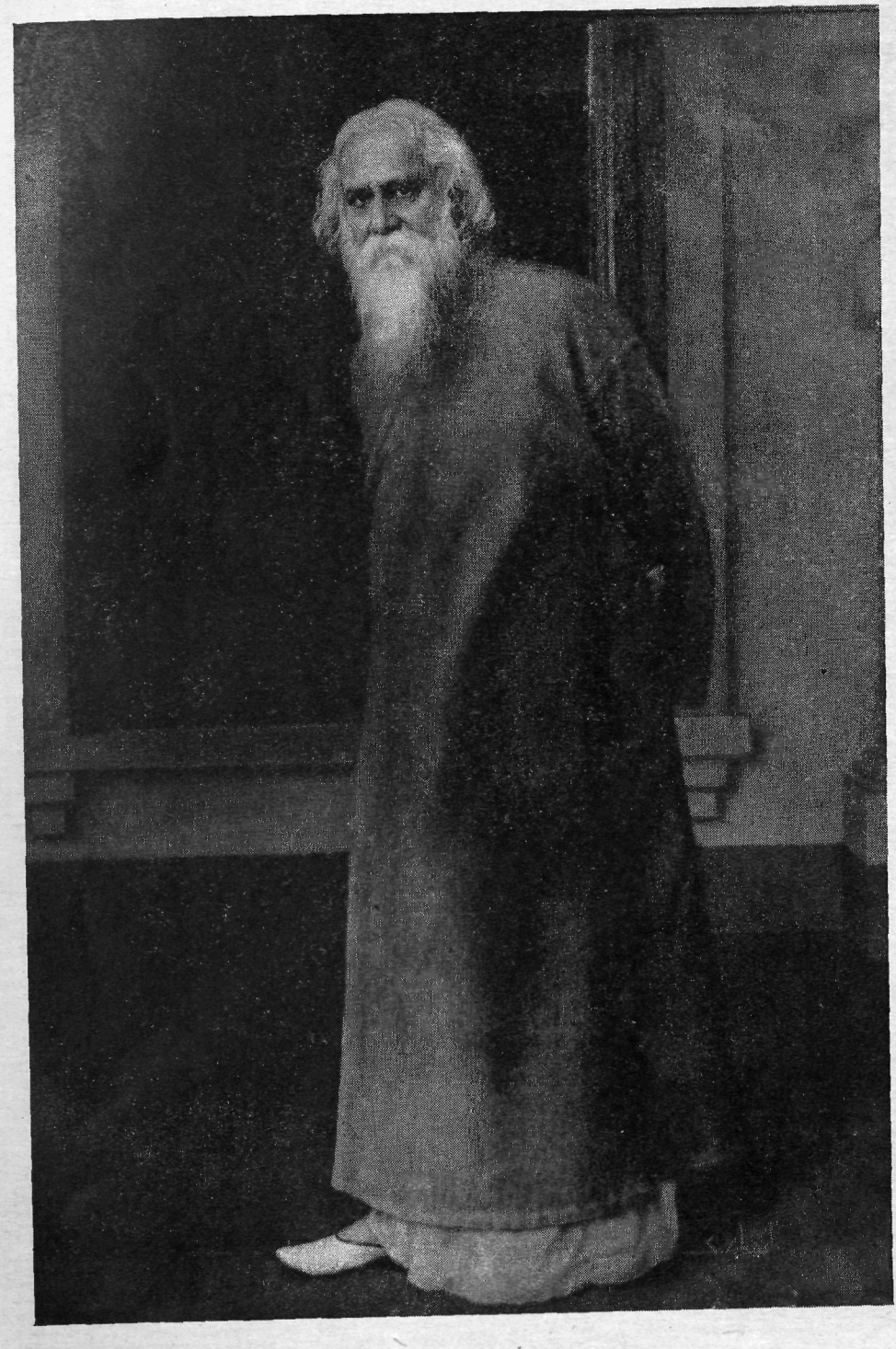

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
[illegible] 1961
* CALCUTTA *

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা
আশ্বিন ১৩৬৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬১

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL.

অস্তরবির আলোর শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ ভাদ্র
১৩৪৪

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমার মনে এর ভাবটি, সংকল্পটি কোন একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে আমি যথোচিত ভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি তাতে ক'রে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল,—আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। "জীবন-স্মৃতি"-তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে, তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইট কাঠ পাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারিদিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোট ছোট কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবন-যাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম, তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানব-প্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর কখনো বা প্রভাতের ঘুমজাগানো গান আর উৎসব কোলাহলের নানা রকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলা-বৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোট বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দ-বেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার আহ্বান করে বলেছে,—"তুমি আমার আপনার, আমার

মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায় আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।" তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে, ছোট ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তারপর আমার মনে আছে যে প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গু জ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মত এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইট কাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠীর পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দুধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ—এই সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে—পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মত গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া, আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কি অপরূপ লেগেছিল তা কি বলব। এই যে বিশ্বজগতে প্রতিমুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্ঘাটিত হচ্ছে, আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একবার "না" হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য, মাধুর্য, তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশ দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থে পাতার পর পাতা উদ্ঘাটন ক'রে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বারবার প্রকাশ করতে থাকে, আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যে রকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল, যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম-জাম-ঝাউ বেত আর শর্ষের ক্ষেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনি মুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যা-

তারায় জ্বল জ্বল করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ্য হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি, এটা আমার জীবনের খুব বড় কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র, মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোনো রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়ীতে নিয়ত ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের আলোচনা হ'ত, আমি এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষা লাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হ'তে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন "স্বপ্নপ্রয়াণ" লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে ও ইতস্ততঃ বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই, তেমনি তিনি খাতায় যতটা লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেই সব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই সকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আপনারা জানেন আমি খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি আর তাতে ক'রে নিন্দাখ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড় সুবিধা ছিল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড় বাজার বসে নি,—ছোট হাটেই পসরা দেওয়া নেওয়া চল্‌ত। তাই আমার বাল্য-রচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয় বন্ধুদের যা একটু আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তারপর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল! সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মত, সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরল বাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করি নি। আমি ৪০।৪৫ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করেছি। আমার কাব্যসৃষ্টির যা কিছু ভালমন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরের

একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদান কার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না—সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে abstract ব্যাপার ক'রে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায়, ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা-প্রণালীতে খুব একটি বড় সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনই অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস ক'রে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে, অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানাভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীনকালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাঁদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাঁদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড় শিক্ষা আছে। এতে ক'রে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি, তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে তিনি কি পূর্ণ আনন্দ বিশ্বের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগ-সাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে এই

অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রে দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদী-তলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনাস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে, তার নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গীসহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভাল-বাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, "আপনি মাস্টারী করতে না জানেন আমি সে ভার নিচ্ছি।" আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্যকরুণ রসের উদ্রেক ক'রে তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোট গল্পকে টেনে টেনে লম্বা ক'রে ৫।৭ দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন ক'রে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরী করবার আমার শক্তি ছিল। এই সব বানানো গল্পের অনেকগুলি "গল্পগুচ্ছে" স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে-গল্পে-গানে রামায়ণ মহাভারত পাঠে সরস হয়ে উঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি ছেলেদের এমনিভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা attitude তৈরী করে তোলা খুব বড় কথা। মানুষের যে এত বড় বিশ্বের মধ্যে এত বড় মানব-সমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এত বড় উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি ক'রে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরী এবং বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা "ভূমৈব সুখম্" এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং। তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তরমেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে ক'রে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন

করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, তাঁরা জেনেছেন যে "ভূমৈব সুখম্"—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সেকথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশ দেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোট বড় সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোন উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যা পূর্ব পশ্চিমবাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না, কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক ক'রে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

"স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সপ্তৃমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা ক'রে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, এই তার বড় পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্যধর্ম বলে বড় ক'রে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালী বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মত শোনাতে পারে, আজকের কথা প্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজা মহারাজারা কোন কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষের প্রতিষ্ঠার অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নাই। আমি এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা

মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসঙ্কোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদান প্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎস-ধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুল বয়' হয়ে একটু একটু ক'রে মুখস্থ ক'রে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তারপর পরীক্ষা পাশ করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না? এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্ততঃ আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকট সম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম, তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না, অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন "এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গবাস।" তিনি যেমন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়াছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন, তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে ফ্রান্স জার্মানি সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনই এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে

কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে ক'রে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা, বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরী হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কল্যাণকর ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে? আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবে না?' আমি জানি যে বাঙালীর মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালী পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙালীর রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র,—যাদের কষ্টের সীমা নেই—তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলা দেশেই করে। বাঙালী যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্র সমাজেই উঠতে পারল না। তাইতো বাঙালীর বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত ক'রে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে বাঙালী বিদ্যা ও বিদ্বান্‌কে অবজ্ঞা করবে না, তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার। তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্য-হোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবী করতে পারি, এই গৌরব আমাদের; মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, কোনো মোহবশতঃ আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই; আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা ক'রে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।*

---

* প্রেসিডেন্সি কলেজ য়ুনিয়নে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত অনুলিখিত।

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ [১]

আমার এই মনে হয়, ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ জ্ঞানের ও ভাবের সম্পদ গ্রহণ করছে, সেটা সত্য কথা। বর্তমান কালের ধর্মের বিরুদ্ধে গেলে মানুষকে ঠকতে হবে। যারা বর্তমান কালের মধ্য দিয়ে যায় নি, সে সমস্ত দেশ জীবন-সংগ্রামে পিছিয়ে পড়বে। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে যারা সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তারাই উন্নতি করছে। বর্তমান যুগ ইয়োরোপীয় সভ্যতার যুগ। এখন এমন কোনো জিনিষ চলবে না, যা ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ছন্দ রক্ষা না করে চলবে। বিশ্বপৃথিবীর সহিত আমাদের ব্যবহারের মূলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা। ইংরাজীর ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছি, সেটাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবো। আজকে সেটাকে যদি ব্যবহারে না লাগাতে পারি ত' আমরা ঠকবো। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যদি আয়ত্ত না হয় তা হলে যা আমরা শিখব তা প্রয়োগ করতে পারব না। যাঁরা ইংরাজী শিক্ষা করবেন, তাঁদের আপনার ভাষায় প্রকাশ করবার জ্ঞান যদি না জন্মায়, তা হ'লে সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মরুভূমিতে বৃষ্টিপতনের মত হবে। যেখানে আমরা ইংরাজীর ভিতর দিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করছি, সেটা যাতে সর্বত্র প্রচার করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের হৃৎপিণ্ডের একটা কাজ হ'চ্ছে—একবার রক্ত সেখান থেকে আসে, সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানদেহের হৃৎপিণ্ড মনে করলে দেখা যায় তার দুইটি ক্রিয়া আছে—তার একদিক দিয়ে জ্ঞান এসে জমবে, তারপর চারিদিকে সেটা পরিব্যাপ্ত হবে। দুইটিই চাই, কোনটিকে অবজ্ঞা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা আর থাকবে না। এ কথা অত্যন্ত সহজ কথা। এ সকল কথা বলতে গিয়ে যে যুক্তি দিতে হবে এ আমি মনে করি না। তবে যখন দেশে অস্বাভাবিকতার উদয় হয়, তখন সহজকেও বিশেষ করে বুঝতে হয়। ইংরাজী ভাষার চর্চায় পাছে লেশমাত্র ব্যাঘাত হয়, এইটে মনে রেখে আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে যে কুণ্ঠা দেখা যায়, সেটা ইংরাজের মনে ত' দেখি না। একটা কারণ, ইংরাজী ভাষায় আমাদের জীবিকানির্বাহের প্রয়োজন আছে। যেখানে ইংরাজী শিখলে রাজকর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে একটা আশঙ্কা হয়, যদি এর কোনও শৈথিল্য হয় ত' আমাদের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক হবে।

এ সম্বন্ধে জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা যেতে পারে। ইয়োরোপীয় শিক্ষা যেমন জাপান আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরণের উপায় অবলম্বন করেছে, তাতে ক'রে

---

১ প্রেসিডেন্সি কলেজ বঙ্গীয় সাহিত্যসভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

সে পৃথিবীর মধ্যে খুব বড় একটা স্থান অধিকার করেছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখলুম, ছোট ছোট অল্পবয়স্কা দাসী জাপানী ভাষায় এমন এমন সব বই পড়ছে যে আমাদের শিক্ষিত লোকেও সে সব পড়ে না। আমার বাড়ীর বালিকা দাসী যখন বল্‌লে যে তার 'সাধনা' পড়তে ভাল লাগে, তখন বিস্মিত হয়েছিলুম। তার পর যখন সে দেখালে যে 'সাধনা'র জাপানী অনুবাদ তার হাতে আছে, তখন আরও বিস্মিত হলুম। সেখানকার সাধারণ ব্যক্তি—সমাজে যাদের বড় স্থান নয়—তারা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে—নূতন যুগের নূতন রস, নূতন বার্তা তাদের মনকে অভিষিক্ত করেছে। এর প্রধান কারণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বের জ্ঞানের রস পেয়েছে। এই নূতন যুগের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্যভাব—সমস্ত তাদের দ্বারে এসে পড়েছে—সমস্ত জ্ঞানের ভাবের সম্পদ জাপানের চিত্তের মধ্যে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এইটে যখন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত উন্নতি নির্ভর করছে আমাদের এই নিজের ভাষাকে গৌরবান্বিত ক'রে তোলার উপরে। আমাদের দেশ কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়, কেবল মাটী দিয়ে তৈরী সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়; এই যদি হ'ত তবে ত' চাষবাস ক'রে দিন কেটে যেত আর মনে হ'ত দেশের সম্বন্ধে সব কর্তব্য শেষ করলুম। কিন্তু আমাদের মানসভূমি আছে—আমাদের মন জন্মগ্রহণ করেছে আমাদের দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে—খনিজ পদার্থ প্রভৃতিকে যেমন আমরা ব্যবহারে আনতে পারলে উন্নতি লাভ করি, সেইরূপ আমাদের এই মানস জন্মভূমির এই সাহিত্যক্ষেত্রের সমস্ত শক্তির পূর্ণতা সাধনেই আমাদের উন্নতি। বাঙ্গালা দেশ কি কেবল ইয়োরোপের পাটের বস্তাই যোগাবে? বিদেশের সঙ্গে আমাদের এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ আমাদের দারিদ্র্য দূর করেছে—সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ ক'রে দিয়েছে তার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটুকু কত সামান্য। নীল, পাট, ধান, গরুর চামড়া কি হাড় দেশদেশান্তরে যাবে বলে সেইটুকুই সব হ'ল—তা ত' নয়। আমাদের মানসভূমির কি চাষ বন্ধ থাকবে? সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য কি পৃথিবীকে দিতে হবে না? জ্ঞানের পণ্য, ভাবের পণ্য সম্বন্ধে আমাদের কেবল আমদানিই চলবে আর রফ্‌তানি একেবারে বন্ধ?

সাধারণতঃ শুনতে পাওয়া যায়—অনেকে বলে যে তোমাদের সাহিত্যে আছে কি? কিন্তু সেটা বলতে লজ্জা পাওয়া উচিত। সে লজ্জা ভাষার নয়। আমাদের ভাষার এমন শক্তি আছে যে তাতে আধুনিককালের ও প্রাচীনকালের সমস্ত ভাব বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। যদি শিক্ষার সঙ্গে ভাষার যোগ না করতে পারি, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে না। শিক্ষার সঙ্গে সজীব ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ। আমাদের মন যতটা পায়, সেটাকে আমাদের ভাষার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। ভাষা ও শিক্ষার সংযোগ না থাকলে দুর্গ্রহ হবে। জৈব উপকরণ হ'লে মানুষ যেমন সেটাকে আপনার দেহের সামিল ক'রে নিতে পারে, লালার সঙ্গে মিশিয়ে, জারক রসের মধ্য দিয়ে আপনার

শারীর পদার্থ করে নিয়ে আপনার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ইংরাজী শিক্ষাকে আমরা তেমন ক'রে আপনার জিনিষ করতে পারি নি।' যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাকে ভাষার মধ্য দিয়ে জৈব পদার্থ না করতে পারি, ততক্ষণ সে শিক্ষা আমাদের পরিহাস করবে। এই পরিহাস দিন দিন বেড়ে উঠছে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ত আর দাঁড়িয়ে নেই, যদিও বা এর সভ্য জগতে স্থান নেই, যদিও ভারতীয় রাজসভায় এর স্থান সম্ভবপর নহে, তবুও যখন থেকে আমাদের চিত্তের উন্মেষ হয়েছে, অন্তরের ভিতর তখনই তার জাগরণ প্রথম বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলীর ন্যায় এই ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সুতরাং আজকের দিনে এই ভাষাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমার কথা এই যে আপনারা এতগুলি যুবক আছেন, আপনাদের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে। আপনাদের কাছে কত বড় দাবী ; আপনাদের সকলের কাছে উপস্থিত—দেশের ভাষার দাবী, মানস জন্মভূমির দাবী। এটা ছোট জিনিষ নয়। যা অসম্পূর্ণ আছে, সেটাকে আমাদের চেষ্টায় সম্পূর্ণ করতে হ'বে। এইখানে একটা গৌরবের কথা আছে, বাহির থেকে যা রুটীন ঠিক করা হয়, সেটা আমরা মানতে বাধ্য, কিন্তু যেটা আমরা আন্তরিক প্রীতির সহিত করব, সেটার গৌরব খুব বেশী। এই যে আয়োজন হয়েছে, এই যে ক্ষুদ্র সভাটি অত্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—ইহা সকলকে ছাড়িয়ে যাবে আমি এই আনন্দটুকু জানাবার জন্য আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।

১লা আশ্বিন, ১৩২৪

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ২

"আমি দুর্বলতা ও ক্লান্তিতে আক্রান্ত। একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সুলভ কর্ম, এ দুইয়ে মিলে আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। এ সভার উদ্যোক্তারা যখন আমাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আমি তাতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে আজ আমি এখানে এসেছি। প্রথমতঃ, কবি মনোমোহন ঘোষের মাতামহকে আমি আমার পরম আত্মীয় বলে জানতুম। শৈশবকালে তাঁর কাছ থেকেই প্রথম আমি ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাখ্যান শুনেছিলাম। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীতে আসন পান, তাহা তিনিই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন। যদিও আমাদের বয়সের যথেষ্ট অনৈক্য ছিল তথাপি তারপর অনেকদিন পর্যন্ত দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল। এক এক সময়ে তাঁর আশ্চর্য যৌবনের তেজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

"মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশুবয়সেই তাঁদের আমি দেখেছি। ইংলণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বলাভ করেছেন। সেকথা আপনারা সবাই জানেন। মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় পরিচয় হয়—সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে। সেইদিন সেইক্ষণ আমার মনে পড়ে। যোড়াসাঁকোয় আমাদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় 'সোনার তরী' পড়ছিলুম। মনোমোহন তখন সেই কাব্যের ছন্দ ও ভাব নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু বোধশক্তি দ্বারা তিনি কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আজকে তাঁর স্মৃতিসভায় আমরা যারা সমবেত হয়েছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর যথার্থ স্বরূপ যেখানে—তাঁর মধ্যে যা চিরকাল স্মরণযোগ্য—সে জায়গায় তাঁকে হয়ত দেখেন নি। এ সভায় তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত আছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ঢাকা কলেজে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র হিসাবে যে কেহ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর মধ্যেই তিনি সাহিত্যের রস সঞ্চার করেছিলেন। অধ্যাপনাকে অনেকে শব্দতত্ত্বের আলোচনা বলে ভ্রম করেন—তাঁরা অধ্যাপনার প্রকৃত অধিকারী নন। মনোমোহন ঘোষ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে সাহিত্যের নিগূঢ় মর্ম ও রসের ভাণ্ডারে ছাত্রদের চিত্তকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে শিক্ষা এক চিত্ত হতে আরেক চিত্তে জ্ঞানের

---

২ পরলোকগত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ-স্মৃতিসভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ।

প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, ছাত্রদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এ ঢের বড় জিনিস। যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শক্তি ছিল গান গা'বার জন্যে। অধ্যাপনার মধ্যে যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তাঁর গভীর ক্ষতি হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় কনফারেন্সে গিয়েছিলুম তখন তাঁর নিজের মুখে একথা শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্য সত্যই এমন হত যে ছাত্রদের চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দ বিনিময় হতে পারে, তবে অধ্যাপনায় ক্লান্তি-বোধ হত না। কিন্তু আমাদের দেশে যথার্থভাবে অধ্যাপনার সুযোগ কেউ পান না। যে অধ্যাপক সাহিত্যের যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন ও ছাত্রদের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন করতে চেষ্টা করেন, তেমন অধ্যাপক উৎসাহ পান না। ছাত্রেরাই তাঁর অধ্যাপনার প্রণালীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। তারা বলে, 'আমরা পাস করবার জন্যে এসেছি। নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে আমাদের এমনতর ধারা দেখিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা পাস করবার গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারি।' এই জন্যই অধ্যাপনা করতে গিয়ে ভাল অধ্যাপকেরা ব্যথিত হন। ফলে নিষ্ঠুর শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মন কলের মত হয়ে যায়, তাদের রসও শুকিয়ে যায়। আমাদের দেশে পড়ানটা বড় নীরস। এজন্য মনোমোহন বড় পীড়া অনুভব করতেন। এই অধ্যাপনার কাজে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল।

"অনেক স্থলে ত্যাগস্বীকারের একটা মহিমা আছে। বড়র জন্য ছোটকে ত্যাগ করা, ভাবের জন্য অর্থ ত্যাগ করা, ও আত্মার জন্য দেহকে ত্যাগ করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। কিন্তু যেখানে যার জন্যে আমরা মূল্য দিই তার চেয়ে মূল্যটা অনেক বেশি, সেখানে ত্যাগ দুঃখময়। এই কবি—বিধাতা যাঁর হাতে বাঁশী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বদ্ধ হলেন তখন তা' তাঁকে কোন সাহায্য করে নি। আমি তাঁর সেই বেদনা অনুভব করেছি। আজকের দিনে তাঁর স্মৃতিসভায় আমি সেই বেদনার কথা নিয়ে এসেছি। যে পাখিকে বিধাতা বনে পাঠিয়েছিলেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচায় বদ্ধ করা হয়েছিল, বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। আজ আমাদের সেই বেদনার অনুশোচনা করবার দিন। তাঁর কন্যা লতিকা যা বললেন সেকথা সত্য। তিনি নিভৃতে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, প্রকাশ করবার জন্যে কোন দিন ব্যগ্রতা অনুভব করেন নি, নিজেকে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। একদিকে এটা খুব বড় কথা। এই যে নিজের ভিতরে নিজের সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকা, নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখা, সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রাখা—এ খুবই বড় কথা। তিনি কর্মকাণ্ডের ভিতরে যোগ দেন নি। সংসারের রঙ্গভূমিতে তিনি দর্শক থাকবেন, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না এই ছিল তাঁর আদর্শ। কেননা, দূর থেকেই যথার্থ বিচার করা যায় ও ভাল করে বলা যায়। কর্মের জালে জড়িত হলে তাঁর যে কাজ—বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় দেখে আনন্দের গান গেয়ে যাওয়া—তাতে ব্যাঘাত হত। যেমন কোন পাখি নীড় ত্যাগ করে যত ঊর্ধ্বে উঠে ততই

তার কণ্ঠ থেকে সুরের ধারা উৎসারিত হতে থাকে, তেমনি কবি সংসার থেকে যত ঊর্ধ্বে যান ততই বিশুদ্ধ রস ভোগ করতে পারেন ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারেন। মনোমোহন ছিলেন সেই শ্রেণীর কবি। তিনি কর্মজাল থেকে নিজেকে নির্মুক্ত রেখে আপনার অন্তরের আনন্দালোকে একলা গান করেছিলেন। কিন্তু একথা আমি বলব যে, যদিও সাধারণতঃ সংসাররঙ্গভূমির সমস্ত কোলাহলে আবদ্ধ হওয়া কবির পক্ষে শ্রেয়ঃ নয়, তথাপি কাব্যের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন না হলে একটা অভাব থেকে যায়। যদিচ জনতার বাণী মহাকাল সব সময়ে সমর্থন করেন না, তাহলেও খ্যাতি-অখ্যাতির তরঙ্গদোলায় দোলায়মান জনসাধারণের চিত্তসমুদ্র যে কবির বিহারক্ষেত্র একথা অস্বীকার করা যায় না। একান্ত নিভৃত যে কাব্য তাতে একটা সঙ্গহীনতার বেদনা আছে। মনোমোহন যে তাঁর কাব্য প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন নি তার কারণ এই যে, তিনি যে ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই ইংরেজী ভাষায় তাঁর এত সূক্ষ্ম অধিকার ছিল যে আমাদের দেশে আমরা, যারা ইংরেজী ঘনিষ্ঠভাবে জানি নে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, আমাদের পক্ষে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম উৎকর্ষ উপভোগ করা দুরূহ। তিনি জানতেন যে এদেশে তাঁর সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে জুটতে পারে না। যে কোন বিদেশী ভাষা খুব ভাল জানে না তার পক্ষে সেই ভাষার সাহিত্যের মধ্যে একটা অন্তরাল থেকে যায়। যেমন কঠিন জেনানা যাঁরা রক্ষা করেন তাঁদের পক্ষে অন্তঃপুরিকাদের নাড়ী দেখানো কঠিন হয়, পর্দার আড়াল থেকে একজন নাড়ী দেখে ডাক্তারকে বলে দিতে হয়, আমাদের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যও তাই। অন্তঃপুরবাসিনী সাহিত্যলক্ষ্মী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দেখা দেন না, আমরা শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মুখের ভঙ্গিমা—যাতে অর্থ সুস্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলি আমরা দেখতে পাই না। আমি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাই নি তথাপি ইংরেজী সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছি। আমি যখন শেলী ইত্যাদি পড়ি তখন কোন কোন জায়গায় রসটি ঠিক না বুঝলেও মনে করি মেনে নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া গতি নেই, বিশেষতঃ যখন তা না করলে পাস করা অসম্ভব। ইংরেজীতে মনোমোহন ঘোষের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছিলেন ও অক্সফোর্ডের গুণীদের সংসর্গ লাভ করেছিলেন। কাজেই সে দেশের ভাষার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু যে ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ মিল এ দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব। এই বেদনা ছিল তাঁর জীবনে। তিনি কবি থেকে ইস্কুল মাস্টার হয়েছিলেন। আবার অসামান্য অধিকার নিয়ে যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশী বাজিয়েছিলেন সে ভাষার দেশ এদেশ নয়। তিনি বুঝেছিলেন কবির দিক থেকে তার ঠিক সঙ্গ আমাদের দেশে পাওয়া কঠিন। তিনি যদি চিরদিন ইংলণ্ডে থাকতেন তবে যে সব কবির সঙ্গ বাল্যে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে তিনি এত একলা হয়ে পড়তেন না। পরস্পরের সঙ্গে তাঁর রসবিনিময় হতে পারত। এই রসবিনিময়ের প্রয়োজন যে নাই, একথা কখনো স্বীকার করা যায় না। মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের ভিতর

দিয়াই প্রাণশক্তির উদ্বোধন হয়। মানুষের চিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা রাখে। কেউ অহংকার করে বলতে পারেন না, আমি কবি হিসাবে অন্যের অপেক্ষা রাখি নে। কিন্তু এই সঙ্গ না পেয়েও মনোমোহন ঘোষ হাল ছাড়েন নি। আপনার ভিতরে সমাহিত হয়ে তিনি কাব্যের আরাধনা করে গেছেন। সে কাব্যের জয় জয়কার হউক। মানুষের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার মধ্যে একটা গৌরব আছে। বিশ্বজগতের মানুষের সঙ্গে, একটা সত্যকার যোগ হবে, আমাদের অন্তরের মধ্যে সে ইচ্ছা কি নেই? যখন সে সঙ্গ না পাই তখন অভিমানে বলি, কাউকে আমার চাই নে। মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপনের মানুষের সে স্বাভাবিক ইচ্ছা যখন ব্যর্থ হয় তখনই আমরা অভিমান করে বলি, আমি কারো সঙ্গ চাই নে।

"কবি মনোমোহনের কাব্যের যখন প্রকাশ হবে তখন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কাছে বাংলা দেশের আলোক কি উজ্জ্বল হবে না? তারা কি বলবে না, এদের সৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি আছে? প্রকাশ মানেই হচ্ছে বিশ্বজগতের সর্বত্র প্রকাশ। যে জ্যোতিষ্কের আলো আছে, তার কেবল এপারে প্রকাশ, ওপারে নয়, এতো হয় না। 'সাহিত্য' শব্দের ধাতুগত অর্থ আমি জানি নে। একবার আমি বলেছিলাম, 'সহিত' অর্থাৎ সকলের সঙ্গে যে সঙ্গলাভ। কালিদাস, বেদব্যাস প্রভৃতি সকল মহাকবি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের চিত্ত-জ্যোতিষ্ককে প্রকাশ করেছেন। সকলেই বলেছেন, এ কবি আমাদেরও কবি। যে সমস্ত ঐশ্বর্য দ্বারা বিশ্ব ধনী হয়, সে সমস্ত ঐশ্বর্যদ্বারাই সমকক্ষতার যোগ স্থাপিত হয়। সাহিত্য মানে সমকক্ষতার যোগ। এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজো ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে। আমরা যদিও একটু বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর দোষ নেই। আর কবি ত কেবল ইংরেজও নয়, কেবল বাঙালীও নয়—কবি সকল দেশেরই কবি। এই কবির কাব্য প্রকাশ হলে পর সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করবে। আজ তাঁর স্মৃতিতে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল; তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতেম। তাঁর প্রত্যেক শব্দচয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল—আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে এ সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে—কেবল 'গৌড়জন' নহে—সমস্ত বিশ্বজন 'তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।"

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ছন্দ

গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী
বৈশাখী।
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়
বনস্পতির শাখাতে।
শূন্যমদের নেশায় মাতাল
ধায় পাখী
অলখ পথের ছন্দ উড়ায়
মুক্ত বেগের পাখাতে।
অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে,
সাদায় কালোর দ্বন্দ্বে,
কভু ভালো কভু মন্দে,
কভু সোজা কভু বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধৃবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয় পথের
রুদ্র রথের চাকাতে॥

১৩ অগ্রহায়ণ
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদীশ-প্রশস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ, মানুষের পদশব্দ-তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলে ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার গীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে, বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে—
কাছে থেকে শুনি নাই; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভা-দীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর-সাথে মানবমর্মের আত্মীয়তা;

প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্ত বাণী রেখেছেন ঢাকি',
সেথা তুমি দীপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্তের চূড়ায় উড়ে।
মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম-মাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি 'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

চারুচন্দ্র দত্ত

অধ্যক্ষ মহাশয় ও বন্ধুগণ! আপনারা আজ আমাকে এই সজ্জন সভাতে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। এ-কৃতজ্ঞতার একটি বিশেষ কারণও আছে। আমি এই বিদ্যাপীঠেরই একজন সেকালের ছাত্র। ছ'টি বছর এখানে লেখাপড়ার ছুতোয় অধ্যাপকমণ্ডলীকে অশেষ রকমে উত্ত্যক্ত করে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে দূরদেশে চলে যাই। এই কলেজের পুরোনো ইমারতের প্রত্যেক ঘর প্রত্যেক দালানের সঙ্গে সেই ছয় বছরের মধুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাই আজ এতকাল পরে আবার সেই আবেষ্টনে এসে, তরুণ বন্ধুমণ্ডলীকে সামনে দেখে অসীম আনন্দ বোধ করছি। এ শুভযোগ আপনারা ঘটিয়েছেন, সেজন্য আমি যথার্থই কৃতজ্ঞ।

তবে এ আনন্দ অবিমিশ্র নয়। এর সঙ্গে মিশে রয়েছে বেশ একটা ভয় ও সঙ্কোচের ভাব, কেননা আপনারা আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছেন। বক্তা আমি মোটেই নই, বড়, মেজ, ছোট কোন দরের বক্তাই নয়। সত্যি বলতে আমি কথক শ্রেণীভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, "তুমি গল্প জমাতে পার"। গল্পগুঞ্জন আমি নিত্যই করে থাকি, তবে শুনেছি নিন্দুক লোকে বলে যে আমার গল্পগুলো পুরোপুরি সত্য নয়। হবেও বা; আমি হলপ করে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটা কথা মেনে নিতে রাজী আছি যে, আমি যা বলি তাতে সারগর্ভ কথা বড় একটা থাকে না। তবু এই সারহীন ভাবহীন গল্পেরও একটা স্থান আছে জীবনে! দুটো মিষ্টি কথা শুনে যদি মানুষ দুদণ্ড আনন্দ পায় সেও ত কম লাভ নয়। নাই বা হল সকল সময়ে গুরুগম্ভীর স্বরে উদাত্ত তত্ত্বকথা। পাঞ্চজন্য যাঁর, বাঁশীও তাঁরই।

তাহলে আপনাদের সঙ্গে একরকম বোঝাপড়া হল। আমার কাছে আপনারা উঁচু দরের প্রবন্ধ-নিবন্ধ কিছু চাইবেন না। আমি দু'চারটে গল্প বলে যথাসাধ্য দুদণ্ড আপনাদের চিত্তবিনোদন করতে চেষ্টা করব। তবে আমার ভরসা আছে যে, যাঁর কথা বলব, তাঁরই দীপ্তিতে আমার ক্ষুদ্র গল্প মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠবে। একটা উদাহরণ দিই। কয়েক বছর আগে আমাদের এক ছোট আসরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা হচ্ছিল। বড় বড় গান গোটাদুই হওয়ার পরে একজন তরুণ গাইয়ে হঠাৎ ধরলেন, "ঐ আঁখি রে, আর ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, কি আর রেখেছ বাকী রে"। হালকা গান, হালকা সুর কিন্তু গায়ক খুব দরদ দিয়ে গাইলেন। আসরে বসেছিলেন এক বয়স্থ ভদ্রলোক। এই গান শুনে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। আমরা সবাই স্তম্ভিত। আমাদের একজন

নব্য বন্ধু খুব মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে উঠলেন, "এ কি মশায়, এই গান শুনে আপনার ভাব লেগে গেল!" বৃদ্ধ রেগে জবাব দিলেন, "এই গান? এই গান মানে কি? এর চেয়ে সুন্দর ধর্মসঙ্গীত আমি কখনও শুনি নাই।" কথাটা আপনাদের মনে ধরল কি? বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সব গানই ধর্মের গান, তাঁর জীবনদেবতার আরাধনা। আমি বাড়িয়ে বলছি না।

আপনারা বেদান্তের পুরোনো বাণী নিশ্চয় শুনেছেন, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, "রসো বৈঃ সঃ।" সেই পরম রসে উচ্ছল ছিলেন কবিবর। তাঁর চেহারায়, কথায়, হাসিতে, গানে, সে-রস যেন নিত্য উথলে উঠত। দুহাতে অকাতরে আনন্দ-রস বিলোতেন। যে মানুষ ভগবানকে আনন্দ-স্বরূপ বলে জেনেছে, আরাধনা করেছে, সর্বভূতের অন্তর স্বতঃই তার পানে ধাবিত হয়—তং সংবাঞ্ছন্তি, সংবাঞ্ছন্তি, উপনিষদের এই বাক্য রবীন্দ্রনাথে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছিল।

আমার আজকের এই গল্প-কথার বিষয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথ। মস্ত বড় মানুষ, কিন্তু মানুষ। দানব নয়, দেব নয়, মানব। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন অন্তর দিয়ে, তাই মানুষও তাঁকে ভালবাসত। কি অসাধারণ ছিল তাঁর আকর্ষণী শক্তি। রাগ করতেন মানুষের মতন, কিন্তু সে রাগ থাকত না মনে, তাঁর অন্তরের অনুরাগের অতল জলে তা মিলিয়ে যেত। রাগ বলুন, দুঃখ বলুন, শোক-তাপ বলুন, পুষে রাখতেন না কিছুই। কবির হৃদয় কিনা, তাই আঘাত পেলে তখনকার মত একবার ঝনঝন করে বেজে উঠত, কিন্তু অল্পক্ষণেই সে ঝঙ্কার মিশে যেত—অনন্তকাল মহাকাশে যে রম্য বীণা অবিরাম বাজছে, তার ঝঙ্কারের সাথে।

একবার কে যেন বিদ্বান লোক লিখেছিলেন যে, রবিবাবু lyrical কবি কি না, তাই ওঁর লেখার মধ্যে হাস্যরস নেই। কবিবর সে লেখাটুকু আমাদের পড়ে শুনিয়ে খুব হাসতে হাসতে বললেন, "এত হাসছি, তবু ভদ্রলোক বলে কিনা আমার হাস্যরস নেই"। বাস্তবিক ওঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল খুব গুরুগম্ভীর কথার মাঝেও হঠাৎ একটুখানি হাসবার ও হাসাবার। একদিন উত্তরায়ণে দুপুরবেলা আমি খেতে বসেছি, কবি বসে আমাকে খাওয়াচ্ছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন। অকস্মাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মশায়, আপনি Personal God মানেন?" আমি একটু চুপ করে রইলাম, ওঁর সামনে বাচালতা করতে বড় লজ্জা হত। উনি আমার দিকে আবার তাকাতে অগত্যা আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "আমি ত অন্য কোন রকম God জানি না।" খুব হেসে উঠলেন, "আমারও তাই। তবে তর্ক করতেও ত ছাড়ি না।"

কবিবর যে বিদ্রূপের বাণে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করতে পারতেন, একথা আপনারা সবাই জানেন। সেকালের প্রবন্ধাবলীতে, কবিতায়, এর বিস্তর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

"হিং-টিং-ছট্", "দামু বোসে চামু বোসে কাগজ বানিয়েছে", "কেমনে এ-নাম করিব সহ্য, আমরা আর্য্য-শিশু" বা "মাথায় খাটো বহরে বড় বাঙ্গালী সন্তান" যেমন কাব্যে উদাহরণ, তেমনই গল্পেও অত্যুক্তি, মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে, বড় সাহেব ও ছোট সাহেব ইত্যাদির মত উদাহরণের অভাব নেই। তবে তীব্র বিদ্রূপ ছাড়া বিশুদ্ধ হাস্যরসের রসিকও তিনি ছিলেন। 'রাজা ও রানী'তে "এক বই পিতা নয় তারই নাম ভুলি, দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে" কিংবা "চিরদিন অর্ধাশনে কেটেছে যাহার আজও তার অনশন হল না অভ্যাস" ইত্যাদি এর চমৎকার নিদর্শন। 'গল্পগুচ্ছে' ত কতই আছে। 'শেষের কবিতা'-র মতন অতি করুণ কাহিনীও ব্যঙ্গ শ্লেষ ও কৌতুকে সমৃদ্ধ হয়েছে, তারই জন্য যেন tragedy আরও ফুটে উঠেছে।

যাক, এসব সাহিত্যের কথা, আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিরা আলোচনা করবেন। আমি যা জানি, তাই বলি। ১৯০৭ সালে যখন তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নেতা অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বোধন করে দীর্ঘ কবিতা লেখেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার," আপনারা পড়ে থাকবেন। অরবিন্দবাবু যেদিন ছাড়া পেলেন সেইদিন বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁকে নিয়ে বসে খুব হল্লা করছি, এমন সময় হঠাৎ কবিবর এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কোনরকম মামুলী কৃত্রিম অভিনন্দন না করে একেবারে অরবিন্দবাবুকে জড়িয়ে ধরে খুব হেসে বললেন, "এ কি মশায়, আমাকে ফাঁকি দিলেন, এত করে কবিতাটা লিখলুম।" মুখে মধুর হাসি, কিন্তু গলাটা বেশ ধরা। তারপর সবাই বসে কাজের অকাজের কত কথাই হল, সে-সব উল্লেখ করার স্থান এ নয়। তবে হাসির দিকটা কবি জাগিয়ে রাখলেন যতক্ষণ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের হাসি-তামাশা সব চেয়ে জমত ছোটবড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। নাতনী নন্দিনীকে তিনি যে সব গল্প বলতেন তার কতক কতক ত ছাপা হয়ে বেরিয়েছে, আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন। ছোটদের সঙ্গে বসে যখন কলরব করতেন বহুদূর থেকে তার আওয়াজ শোনা যেত। কবির কাছে আমার যেটুকু কদর ছিল তার একটা মস্ত কারণ আমি এই ছোটদের ভালবাসতাম। এক একদিন এক গাল হেসে বলতেন, "মশায়, আপনি আমার নাতনীদের আমার কাছছাড়া করে নিচ্ছেন।"

একবার দেখলাম জমিদারি থেকে কয়েকজন প্রজা এসেছে আশ্রমে। তাদের নিয়ে কবিবর অনেকক্ষণ ধরে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করলেন। খানিক পরে আমাকে সেখানে ডেকে পাঠালেন, কেননা দুদিন আগে আমি ওঁকে একটু তামাশা করে বলেছিলাম, "আপনি আর আগের মতন অপূর্ব ছোটগল্প লিখতে পারবেন না, কারণ এখন আপনি পাড়াগেঁয়ের দীনদুঃখীর জীবনের থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন।" সেদিন কিন্তু যা দেখলাম তাতে হৃদয় মোহিত হয়ে গেল। বিশ্বকবি এখনও তাহলে আমাদের ঘরের লোকই আছেন। নইলে এদের সঙ্গে অমন প্রাণ খুলে হাসছেন কি করে! আমাদের ঘরের লোক বলছি বটে,

কিন্তু হয়ত আমাদের নয়, গরীব দুঃখীরই আপন জন, যাদের বিষয় লিখেছেন, "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।" সত্যি এই প্রাণ খুলে হাসি বড় একটা দেখতে পেতাম না যখন কবি আমাদের মতন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। বোধহয় আমাদের অন্তরের মলিনতা তাঁর নজর এড়াতে পারত না। তাই দেখতাম যে তাঁর অপূর্ব সৌজন্য একটুও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না বটে, যা করবার সবই করছেন, কিন্তু কোথায় যেন একটু বাধছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষ, তাঁর চাষীরা মানুষ, ছোটবড় ছেলেমেয়েরা মানুষ, কিন্তু ঠিক সে রকম মানুষ আমরা হয়ত হতে পারতাম না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় একটা অভিনয় কি নাচের মজলিস বসেছে। মাঝখানে কবি তাঁর তক্তার উপর সমাসীন, মেয়ে-পুরুষ সবাই তাঁর দুই পাশে নীচে বসে। এমন সময় একটি ছোট্ট আমেরিকান মেয়ে সলজ্জভাবে এসে কবিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, "And how are you this evening, Mr. Gurudeva ?" মেয়েটির মা শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। গুরুদেব কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন, "Quite well, thank you, dear ; come and sit by me." একটা আনন্দের লহর খেলে গেল সারা আসরটাতে। মানুষ মানুষকে খাতির করলেন।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথ কোনার্কের সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। আমরা দু'চারজন কাছে বসে রয়েছি। এমন সময় একটি মুসলমান চাষী সন্তর্পণে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ মশায়, গুরুদেববাবু থাকেন কোথায় ?" লোকটার বেয়াদবিতে আমরা বিচলিত হয়ে উঠলাম। কবিবর কিন্তু মধুর হেসে উত্তর দিলেন, "এই যে গো, আমি হেথায়, কি চাই বল দেখি !" তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারীকে ডেকে তার কাজ হাসিল করে দিলেন। মানুষ কি না !

এইখানে আর একটা গল্প বলি উল্টোরকমের। আপনারা দেখবেন যে রবীন্দ্রনাথ অত সহজে তথাকথিত বাবুলোকেদের বেয়াদবি বরদাস্ত করতেন না। একদিন বিকেলবেলায় উত্তরায়ণের বাগানের কোণে কবি কয়েকজন হোস্টেলের মেয়েদের নিয়ে বসে আছেন। কলকাতা থেকে খুব ভাল কেক এসেছে তাই খাওয়াচ্ছেন। মেয়েরা খুব আমোদ করে খাচ্ছে। আমরা দুই একজন রবাহূতও আছি। হঠাৎ দেখা গেল যে দুজন ভদ্রবেশী তরুণ অদূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছেন। কবি তাঁদের দিকে বার দুই স্থিরদৃষ্টি হানা সত্ত্বেও তারা সরে গেল না, হাঁ করে দেখতেই থাকল। আমাদের হাত বাঁধা, কেননা আমরা জানি যে গুরুদেব চেঁচামেচি বা রূঢ় ব্যবহার ভালবাসেন না। অবশেষে মেয়েরা যখন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তখন তিনি নিজেই ভর্ৎসনার স্বরে চেঁচিয়ে বললেন, "আমি আমার বাড়িতে আমার মেয়েদের নিয়ে গল্প করব, সেখানেও তোমরা উপদ্রব করবে !" অবশ্য একবার

ইঙ্গিত পেতেই আমাদের একজন তরুণ তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে বাবুদের অপসারিত করলেন। কবি শুধু এইটুকু বললেন, "এদেরও কি ভদ্রলোক বলতে হবে?" তারপর আমোদ-প্রমোদ আবার পূর্ববৎ চলল।

জগতে একরকমের লোক থাকে যারা কেবলই দিয়ে যায়। ভগবান তাদের এখানে পাঠান শুধু এই দেবার জন্য। তবে নিছক দেনেওয়ালা মানুষ পৃথিবীতে খুব দুর্লভ। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজন ছিলেন। তাঁর অনুপম রূপ একবার দেখলেই মনে হত কত কি পেলাম। একটু কাছে বসে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনলে তার জের বহুদিন চলত। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁকে দেখেছি অনেক, তাঁর কথাও শুনেছি অনেক। তিনি কথা কইতে জানতেন ও কইতেন নানা বিষয়ে, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, ললিতকলা, সকল বিষয়েই। কথা কইতেন, কিন্তু মাস্টারি করতেন না। শ্রোতা যা পেত, তা সোনারূপার মত ভারবান নিরেট বস্তু নয়। সবই যেন সুন্দর, সু-বর্ণ, সুগন্ধ ফল। আনন্দময়ের যে আনন্দ তাঁর ভিতরে মূর্ত হয়েছিল সেই আনন্দ অকাতরে পরিবেশন করতেন তিনি।

আমি নিজে পেশাদার লেনেওয়ালা। চিরজীবন যা যেখানে পেয়েছি, কুড়িয়ে বেড়িয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মতন আনন্দের খনি হাতের কাছে পেয়ে যে আনন্দ লুটেছি, তা আমার জন্মজন্মান্তরে কাজ দেবে। তবে একটা কথা মুক্তকণ্ঠে আপনাদের কাছে স্বীকার করি যে, আমি কেবল নিয়েছি, নির্লজ্জভাবে নিয়েছি, দিতে পারি নি কিছু। কি আর দেব বলুন, ওঁদের কি আর সত্যি কিছু দেওয়া যায়! আকাশের হাওয়া, নদীর জল, সূর্যের আলো এদের ঋণ পরিশোধ করতে চাওয়া বাতুলতা। ভালবাসা যদি কিছু দিতে পেরে থাকি ত সে মুখে বলবার কথা ত নয়! তিনি নিজে হয়ত জানতেন।

দুই একদিন ক্বচিৎ কখনও কবি এক আধটা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন—একা একা বসে। চিরদিন মনে থাকবে। একদিন টেবিলে মনে আছে, "ওহে জীবনবল্লভ" গাইলেন চোখ বুজে খুব ধীরে ধীরে। সে গান নয়, ধ্যান। আমার এক বন্ধু সেখানে ছিলেন, তারই জন্য সেদিন গাওয়া, তিনি এখনও ঐ দিনের গানের কথা বলতে বলতে চোখের জল রাখতে পারেন না। আর একদিন কবি শুনিয়েছিলেন তাঁর সোনার বাঙলা। "তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে, তোমার ধুলোমাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি" গাইতে গাইতে স্বর বন্ধ হয়ে গেল, ছলছল চোখে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন একটুক্ষণ ; তাঁর বিষণ্ণ মুখে আমি সোনার বাঙলার জীবন্ত রূপ দেখতে পেলাম ; জীবন ধন্য হল।

অনেক বুদ্ধিমান লোকে জিজ্ঞাসা করেন, রবিবাবু কি সাধক ভক্ত ছিলেন। হয়ত তাঁরা খুব খুশী হবেন যদি আমি বলি যে না, তিনি তা ছিলেন না। কিন্তু সত্যের খাতিরে তাঁদের নিরাশ করতে হল। রবীন্দ্রনাথ পরম ভক্ত, শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি মায়াবাদের ধার ধারতেন না, হঠযোগের যৌগিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর কোন কুতূহল ছিল না। কিন্তু

৩৮৪৫২

তিনি বিরাট বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে পরম সুন্দরকে মূর্ত দেখতেন। এ বিষয়ে তাঁর এতটুকু দ্বিধা সংশয় ছিল না। তিনি বারবার বলতেন, কর্ম ছেড়ে যে সাধনা তাকে আমি মানি না—কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। বস্তুতঃ তিনি যেমন প্রেমের আনন্দে কর্ম করতেন, তেমনই আবার একান্তে নিভৃতে পরম প্রেমাস্পদের সাথে নিবিড় মিলনানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। একথা যে শুধু তাঁর লেখা পড়ে জেনেছি, তা নয়। যা চক্ষে দেখেছি, কানে শুনেছি, তাই বলছি।

শান্তিনিকেতনে থাকতে অনেক সময় ভোরে ওঁর কাছে যেতাম। গিয়ে এক একদিন দেখতাম যে চুপটি করে চোখ বুজে বসে রয়েছেন উঠন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে, রক্তিম আভাতে সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত। পনের বিশ মিনিট অবধি এ রকম নিশ্চল বসে থাকতে দেখেছি। তারপর হয়ত চোখ খুলে অনুচর বনমালীকে ডাক দিলেন। আমাকে দেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন! বনমালী, আমাকে ডাকতে পারিস নি!" পরে অনেকবার ওঁকে বলেছি তর্কের ছলে, "আপনি যে বলেন, ধ্যানধারণা কিছুই নয়, আমি শুধু কর্মই জানি; তাহলে উঠন্ত সূর্যের পানে ফিরে চোখ বুজে ওকি কর্ম করেন!" উনি হেসে জবাব দিয়েছেন, "না, আমি ধ্যান করি না।" বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ছিল একটা জীবন্ত সত্য—চিরসুন্দর উপলব্ধি, rational religion নামক জগা-খিচুড়ি নয়। এ যারা জানে না, তারা কবিবরকে চিনলে না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" একি কখনও rational construction—বুদ্ধি-গঠিত ধারণা হতে পারে! ভারী কথা এসে পড়েছে, আর এ সম্বন্ধে কিছু বলব না। কিন্তু কবির ধ্যানী মূর্তি কি সুন্দর!

এসব কথা যা বলছি, এ আমার বুড়ো বয়সের কথা। আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন ছেলেবেলায় আমার সুদূর জন্মস্থানে "বালক" পত্রিকার পাতায় তাঁর রাজর্ষি উপন্যাস পড়তাম। ১৮৯০ হতে ১৮৯৬ পর্যন্ত আমার কলকাতায় ছাত্রজীবন। ঐ সময় কবিবর আমাদের জন্য মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পড়তেন, কখনও Scottish-এর হল-এ, কখনও বা কোনো থিয়েটারে। আমরা দল বেঁধে যেতাম প্রবন্ধ পাঠ শুনতে, আর শেষ হয়ে গেলে 'গান গান' করে বিষম চীৎকার জুড়ে দিতাম। ঐ সময়ের বিখ্যাত গান—"তবু পারি না সঁপিতে কেন প্রাণ", "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না", "আমায় সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও" ইত্যাদি সর্বদা আমাদের ছোট ছোট বৈঠকে গাওয়া হত। আমরা আমাদের রবিবাবুকে দেখে, তাঁর মধুর গান শুনে ভরপুর হয়ে বাড়ি ফিরতাম। প্রবন্ধ খুব বুঝতে পারতাম না, অন্ততঃ আমার মত বোকা মানুষ যারা। তাতে কিছু এসে যেত না, তিনি আমাদেরই রবিবাবু ছিলেন ত! এই সময় আমার ভারী একটা সুবিধা হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

১৮৯৪ সালে বোম্বাই-এর নেতা ফিরোজশাহ মেহতা ব্যবস্থাপক সভাতে খোলাখুলি সিভিল সার্ভিসের হাকিমদের জোর নিন্দাবাদ করাতে সরকার পক্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সরকারের ক্ষোভে কলকাতার জনসাধারণের খুব আনন্দ হল। মনের আবেগে তাঁরা স্থির করলেন যে মেহতা সাহেবকে টাউন হলে মস্তবড় জলসা করে অভিনন্দন দেওয়া হবে। এই উপলক্ষে যে ছোট এক কমিটি গঠিত হল, রবীন্দ্রনাথ তার একজন উৎসাহী মেম্বর হলেন। আমি ঐ ব্যাপারে খুচরো খাটা-খাটুনি কিছু করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল। তিনি আমার উৎসাহ দেখে একটু পিঠ চাপড়েও দিয়েছিলেন। আর আমায় পায় কে! রবিবাবু আর আমার কাছে দূরস্থ দেবতা রইলেন না, "কড়ি ও কোমল", "মানসী", "সোনার তরী"র কবিও রইলেন না; ভারত উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর তাঁবে যখন কাজ করলাম, তখন তিনি আমার চোখে একজন বড় রাষ্ট্রীয় নেতাই হলেন! পরে কিছুদিনের জন্য এ সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। তবে সে বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলব না এখানে।

১৮৯৯ সালে যখন আমি দীর্ঘ প্রবাস থেকে দেশে ফিরলাম, তখন কলকাতায় সঙ্গীত সমাজের খুব বোল-বোলাট। সেখানে আমার শ্বশুরমহাশয় ও রবিবাবু প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। বছর খানেক কি বছর দুই বাদে যখন ওঁরা 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করলেন, তখন কবি হলেন রঘুপতি আর শ্বশুর মহাশয় জয়সিংহ। বলতে ভুলে গেছি যে এঁরা দুজনেই ১৮৯৪ সালের মেহতা অভিনন্দন কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই থেকে দুজনের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছিল। এঁদের নানা গূঢ় মন্ত্রণাসভায় আমি ও ৺সুরেন ঠাকুর মহাশয় তরুণ কর্মী হিসাবে উপস্থিত থাকতাম। এসব কথা বলছি প্রধানতঃ এইজন্য যে দেশে যখন একটা প্রবল ভাবের বন্যা ডাকে তখন কি মানুষ রবীন্দ্রনাথ, দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ, তাতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন! সাড়া ত তিনি দিয়েছিলেন, আপনারা জানেন ১৯০৫ সালে জাতীয় মিছিলে "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে" গান গেয়ে।

আবার সাড়া দিয়েছিলেন ১৯১৯ সালে সরকারদত্ত খেতাব প্রত্যর্পণ করে। কিন্তু এই প্রবল দেশপ্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল বহুপূর্বে যখন তিনি ছাত্রদের কাছে গেয়েছিলেন, "যদি মান পেতে চাও, যদি প্রাণ পেতে চাও, তবে প্রাণ আগে কর দান।" তারপরে এই শতাব্দীর আরম্ভে যখন লাট কর্জন সাহেব নানা রকমে দেশবাসীকে অপমান করতে উদ্যত হলেন, তখন তার প্রকাশ্য প্রত্যুত্তর কবিবর নানা রকমে দিলেন। এসব কথা আমরা জানি। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কাজ ত সবটাই প্রকটভাবে চলে না। এর একটা নিগূঢ় স্বরূপও থাকে। তার সঙ্গে আমাদের কবির কি বা কতটা সম্বন্ধ ছিল তা বলবার সময় এখনও আসে নি। অন্ততঃ এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে। জাপানী মনীষী ওকাকুরা মহাশয়ের এদেশে আগমন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা, আমার শ্বশুরমহাশয়

হেমবাবুর সঙ্গে উভয়ের যোগ, হেমবাবুর পুত্রের ওকাকুরা মহাশয়ের সঙ্গে জাপান গমন, কলকাতায় শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান, কবির পুত্র রথীন্দ্রবাবুর আমেরিকা যাত্রা—এই সমস্ত ও অন্যান্য ঘটনাবলীর পিছনে কোন গূঢ় ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে বলে মানুষে সন্দেহ করত। অন্ততঃ কবিবরের বোলপুর বিদ্যালয়ের উপর সরকারের বক্রদৃষ্টি অনেক দিন অবধি ছিল।

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতাটির উপরে উল্লেখ করেছি। সে কবিতার পিছনে কি ভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন বোমার মামলা, ধর-পাকড়, খুনোখুনি ও হিংসা-প্রতিহিংসার তাণ্ডব শুরু হল তখন কবিবরের স্বভাবতঃ আনন্দময় ও শান্তিপ্রিয় হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হল। "পথ ও পাথেয়" ইত্যাদি নানা লেখা লিখে তিনি দেশের ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত তরুণমণ্ডলীর মন ঠাণ্ডা করতে প্রবৃত্ত হলেন। তবে দাবানল জ্বালান সোজা, নেবান শক্ত। যদি নেবে ত সে স্বাভাবিক কারণে, জল ঢেলে তাকে নেবান যায় না। কালের গতিতে আগুন নিবল; আবার জ্বলল, আবার নিবল; এইভাবে চলে আসছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়ে আর এক পথে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। তাঁর প্রতিভা স্বভাবতঃ সৃজনোন্মুখ, প্রলয়ঙ্করী নয়। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় সারা দেশ জুড়ে যে বিক্ষোভ এসেছিল তার একটা দিক ছিল জাতীয় শিক্ষা, সমাজসংগঠন ও পল্লীসংস্কার। এই দিকটাতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী, শুধু ভাবুক হিসেবে নয়, কর্মী হিসেবেও। যখন মারামারি কাটাকাটির সূত্রপাত হল তখন তিনি পরিপূর্ণ উদ্যমে এই সমস্ত কাজ মাথায় তুলে নিলেন। ফলে ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা, কবির বারংবার বিদেশ ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রচার ও বিশ্বভারতীর স্থাপনা।

এ সময়টাতে আমি বড় একটা দেশে থাকিনি, কবিবরের সার্বভৌম আদর্শের অভিব্যক্তি দূর হতেই দেখছিলাম। পরে যখন আমার সময় এল, তখন তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। আগেই বলেছি তাঁর কাজ আমি বিশেষ কিছুই করতে পারি নি। তবে আমার নিজের বিস্তর লাভ হল। কয়েক বৎসর ধরে অন্তরঙ্গভাবে তাঁর কাছে থাকতে পেলাম। দেখলাম যে এ রবীন্দ্রনাথ আর আমার সে পুরোনো রবীন্দ্রনাথ নয়। তাঁর মনের বিক্ষোভ চাঞ্চল্য উত্তেজনা সব যেন চলে গেছে। অন্তরে সারা বিশ্ব একনীড় হয়েছে। মানুষ মহামানুষের পদবীতে উঠেছেন। তাঁর জীবনের আনন্দ তরঙ্গায়িত হচ্ছে সমগ্র জগতে। পুরোনো সেই মনোরম কান্তি যেন আরও প্রশান্ত সুন্দর হয়েছে। কয় বৎসর তাঁর সংস্পর্শে থেকে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে তিনি আমার দৃষ্টিকেও সঙ্কীর্ণতার পাশ থেকে মুক্ত করে উদার বিরাটের পানে নিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর লেখা পড়েই মানুষ হয়েছিলাম, তিনিই আমাকে আমার শেষ পথ ধরিয়ে দিলেন।

কবিবরের সাধের বিশ্বভারতীর আদর্শ জগৎ নিতে পারে কি? পারবেই একদিন। তবে যে তুমুল কালবৈশাখী আজ ক'বছর বইছে, এর মাঝে কি আর নূতন কিছু গড়ে ওঠা সম্ভব! রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সর্বভূতে প্রেম, অকপট প্রেম—তাঁর সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম-এর উপলব্ধি। এই পরিপূর্ণ প্রেম, এই বিরাট অনুভূতি যদি রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবন্ত থাকে ত একদিন তাঁর সার্বভৌম আদর্শ গৃহীত হবে, নইলে নয়। এ জোড়াতালির কাজ নয়।

আর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, তিনি তাঁর জল্পনা-কল্পনা ভাবনা-ধারণা খেলাধুলোর অনেক উপরে। বাহিরের জগৎ তাঁকে মনে রাখবে কি না, জানি না। তবে বাঙ্গলার জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে তিনি অমর হয়ে রইলেন। বীরভূমের প্রান্তরে জয়দেবের কেঁদুলী ও চণ্ডীদাসের নান্নুরের সঙ্গে রবিবাবুর শান্তিনিকেতনের মেলা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বসবে। সেইখানে, যেখানে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' তাঁর মন ভুলিয়েছিল, সেইখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

পরিশেষে, শরৎচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলি, কবিগুরু, তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজ নতশিরে বারবার নমস্কার করি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত এবং শ্রীঅমল বসুর সৌজন্যে "অলকা" পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথ

হুমায়ুন কবির

প্রভাতের দীপ্ত রবি রজনীর নিঃশব্দ গহন
তিমির উদ্ভাসি',
পূর্বাকাশপ্রান্তে যবে আঁকে তার রক্ত-আলিম্পন
আলোকের জয়গানে নিখিল ভুবন ওঠে হাসি'।
অন্ধকার শিহরিয়া দূরান্তরে সভয়ে মিলায়,
জীবন চঞ্চলি' ওঠে নৃত্যশীল আনন্দ-লীলায়,
কুঞ্জে ফোটে পুষ্প রাশি রাশি।
হে কবি, আলোকরথে পূর্ব হতে পশ্চিম গগনে
যাত্রাপথ তব,
বিশ্ববিজয়িনী তব প্রতিভার প্রদীপ্ত কিরণে
বিমুগ্ধ ভুবন আনে পদতলে অর্ঘ্য নব নব।
পূরব পশ্চিম আজি ভুলিয়াছে প্রাচীন কলহ
তোমার বিজয়গান নভোপানে ওঠে অহরহ
আনন্দ-উচ্ছল কলরব।
জীবন-প্রভাতে কবে যাত্রা তুমি করেছিলে কবি,
আশার আলোকে,
সংসার সংঘাত লাগি' চিত্তে তব জাগে যত ছবি
অমর প্রতিমা গড়ি' রূপ তারে দিলে মর্ত্যলোকে।
শরৎ আকাশতলে অপরূপ আলোক উৎসব,
বসন্ত পূর্ণিমা-রাতে মোহময় গীতিকলরব!
উচ্ছ্বসিল প্রকাশ-পুলকে।
স্বচ্ছ লঘু মেঘসম যে স্বপন অন্তর আকাশে
ভেসে যায় চলে,
যে আকাঙ্ক্ষা অগ্নিগর্ভ গিরিসম বিদ্যুৎ-বিকাশে
জ্বালাময় শিখা মেলি সুগভীর অন্তরের তলে,—
স্বপনবিলাসী চিত্ত রচে তব বিরামবিহীন
সে আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়া সঙ্গীতের সুধা নিশিদিন
কভু হাসি কভু অশ্রুজলে।

নিখিল অন্তরমাঝে জাগে সেই দুর্বার আবেগ
গভীর ক্রন্দন,
পর্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
ভেসে যেতে নভস্তলে ছিন্ন করি' মাটির বন্ধন।
সুদূর গগন-পারে কায়াহীন আকাঙ্ক্ষার ভরে
অনন্ত আলোক মাগি' তৃপ্তিহারা অন্তর গুমরে
খুঁজে ফিরে আশার নন্দন।
তোমার জাগ্রত আত্মা ছড়াইল দিগ্‌দিগন্তরে
যে অমৃতবাণী,
নিখিল মানবচিত্ত সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ভরে
বরণ করিল তারে সঞ্জীবনী প্রেমমন্ত্র জানি'।
তোমার অন্তর মাঝে অসীম খুঁজিয়া ফেরে সীমা,
তিমির উজলি তোলে মানবের বিপুল মহিমা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত আলোকরশ্মি হানি।
প্রভাত-সঙ্গীত গাহি', আনন্দের উচ্চরোল তুলি'
বাহিরিলে পথে,
যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল রজনী দিনগুলি
মানসীর লাগি তব সাজাইলে অন্তর আলোতে।
ক্ষণিকার পরশনে ভাসিল সোনার তরীখানি
খেয়াঘাটে বসি' তব চিত্ত ভরি' উচ্ছ্বসিল বাণী
সঙ্গীতের স্বপ্ন-সুধা-স্রোতে।
পূরবীর ছন্দে আজি রবির বিদায়-বীণা বাজে
ক্লান্ত সুগম্ভীর,
আসন্ন বিরহব্যথা মেঘমায়া রচে চিত্ত-মাঝে,
নয়নের কোণে ঝলে মুক্তাবিন্দুসম অশ্রুনীর।
সে অশ্রুমালিকা কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরণীতে
তোমার অমর আত্মা যৌবনের বিজয়-সঙ্গীতে
জাগাইবে মূর্ছনা মদির।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে আয়োজনে আজ দেশ বিদেশ ব্যাপৃত তাহার উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা বাংলা ভাষাভাষী নহেন তাঁহারা কবির কীর্তির সমাদর করিবেন, আর আমরা শ্রদ্ধানত শিরে ও সগৌরবে স্মরণ করিব বঙ্গভারতীর সেই বরপুত্রকে যাঁহার সুদীর্ঘ সাধনায় ও অপূর্ব সিদ্ধিলাভে আমাদের বহু রিক্ততা সত্ত্বেও আমাদের মাতৃভাষা অন্যান্য প্রদেশে শুধু নয় সমগ্র জগতে আজ সাহিত্যসৃষ্টিজাত পণ্য বিতরণে সক্ষম হইয়াছে। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় নব বঙ্গ সাহিত্যের প্রগতি আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—

> "আজ আমরা একথা বলিয়া অলীক গর্ব করিতে পারিব না যে আমাদের তরুণ বঙ্গ সাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্য সমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে।" "তথাপি বঙ্গ সাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধমোহবশত? তাহা নহে।" "আজ বঙ্গ সাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এমন এক নূতন প্রাণশক্তি, এক দৃঢ় বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে, সমস্ত বঙ্গহৃদয়ে সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে।" "এখন সে ভিখারিণী বেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে।"

এই ভিখারিণীকে "মহীয়সী" করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র। অভিনন্দনের মালা বদল করিয়া সেদিন সবেমাত্র তিনি অকালে অস্তমিত। তবে কবির ভাষায় "তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া ভাবমন্দাকিনীর অবতারণা" করিয়া এবং "সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া" গিয়াছিলেন। ইহাও কবির ভাষায় "সাময়িক মত নহে, ঐতিহাসিক সত্য।"

কিন্তু তথাপি পরিষদ ভবনের সেই ভাষণে কবি সেদিন বলিয়াছিলেন—

> "নব বঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে আর একশত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসবসভায় যে সৌভাগ্যশালী বঙ্গ সাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন তিনি আমাদের মত প্রমাণ রিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশায় এবং অনুরাগে, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া", "অতি প্রত্যুষের অকস্মাৎ জাগ্রত একক বিহগের অনিশ্চিত মৃদু কাকলীর স্বরে সুর বাঁধিবেন না—তিনি

স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমান উৎসাহের আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন, এবং কোন কালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল এবং অদ্যকার আমরা যে প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্বল কণ্ঠে গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সেকথা কাহারও মনেও থাকিবে না।"

কিন্তু সেকথা বিস্মৃত না হইয়াও আমাদের মনে পড়ে ঐদিন হইতে শতবৎসর পরে নহে অনধিক বিশ বৎসরের মধ্যে কবির পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা টাউন হলে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সেই অভিনন্দনসভায় কবিগুরুকে সম্বোধন করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

"জগৎ কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব
বাঙ্গালী আজ গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব
দর্ভ তোমার আসনখানি অতুল বলি লইব মানি
হে কবি, তোমার কবিতাগুণে জগৎ কবি সর্ব।"

আর সেই উপলক্ষেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কবির জয়যাত্রার সাফল্য কামনা করিয়া "শঙ্কর! তোমায় জয়যুক্ত করুন" প্রার্থনা জানাইয়া অভিনন্দন পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের আশার বাণী, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রার্থনা বিফল হয় নাই। তিন বৎসরের মধ্যে কবির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটে এবং কবির মাতৃভাষা এবং সাহিত্য বিশ্ববন্দনা লাভ করে এবং "অতীতের অমানিশীথের একাধিপত্য" ১৩০১ সাল হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে কাহারও আর স্মরণে আসিবার অবকাশ থাকে না। তাহার পরে অর্ধ শতাব্দী অতীত না হইতেই আজ যদি কবির জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের দিনে রবিকিরণোদ্ভাসিত বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্য বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানে দেশ দেশান্তরে সমাদৃত হয় তাহা অপেক্ষা আমাদের আনন্দের বিষয় এবং কবির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শুভ সুযোগ আর কি হইতে পারে?

কিন্তু এখানেও আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমতঃ দেশভেদে যেমন ভাষা ভিন্ন হয় তেমনি জাতিভেদে রচনার আদর্শও বিভিন্ন হয়। কবির ভাষাতে বলা যায় "যে জাতি খণ্ডসত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন—মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকেও যাঁহারা বলিয়াছেন 'ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য', যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদের ঋণও কোন কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের

পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানব সভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতা মধ্যে নিঃশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে।"

আজ বর্তমান জগতে ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানা-ঘর হয়তো অপরিহার্য, জনতার স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব রসস্রষ্টার চিন্তনীয় না হইতেও পারে কিন্তু "পরিপূর্ণতার সুষমা" এবং "বিরোধের শান্তির" দিক দিয়া যদি আমাদের জাতির আদর্শ, যদি আমাদের জাতির চিরন্তন সাধনার সাধ্য 'রসো বৈ সঃ' রূপে যাহা আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যে পরিকল্পিত এবং কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে ধ্যানমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত, আজ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দিনে তাঁহার কবিকীর্তির এই প্রেরণামন্ত্র যদি আমরা বিস্মৃত হই তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রকৃত সমাদর করিতে পারিব কিনা ইহাই আমাদের তরুণদের বিশেষ চিন্তনীয়। আর দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কবি তাঁহার "শেষ লেখায়"ও নিজে বিশ্বকবির পদবী দাবী না করিয়া "বিধাতার বিশ্বকবিত্বের সাক্ষীরূপে দর্শন" দিয়াছিলেন বলিয়া নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার দিনে বিশ্ববিধাতাকে আমল দিতে না চাহিলে 'নৈবেদ্য' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে'র কবির গীতগান সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা সম্ভব কি না তাহারও উত্তর আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার।

"Science can give us power but it is only religion that can give us peace." ইহাও আমাদের মহাকবিরই উক্তি।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই কলেজে আসিয়া আজ এক পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। আমরা যখন ফার্স্ট আর্টস্ পড়ি তখন আমরা Leisure Hour Club নামে এক ছাত্র-সমিতি স্থাপন করি। আমাদের তৎকালীন সংস্কৃতের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন। আমাদের ক্লাবের চেষ্টায় আমরা সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালে এই কলেজে প্রথম কবির 'রাজা ও রানী' নাটকের অভিনয় করি। তাহার পূর্বে এই কলেজে ইংরাজী নাটক ব্যতীত আর কোন নাটক অভিনীত হইত না। আমরা কোনমতে অভিনয়ের অনুমতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু ইংরাজী নাটক অভিনয়ের ঐতিহ্য ভঙ্গ করিয়া আমরা নাকি সেদিন কলেজের মর্যাদাহানি করিয়াছিলাম। আজিকার দিনে তাহা অপবাদের কথা না হইয়া উপহাসের বিষয় হইবে মনে করি।

আমার ভাষণ যদি দীর্ঘ হইয়া থাকে সকলে ক্ষমা করিবেন।*

---

* রবীন্দ্র-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শতবার্ষিকী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

ছাত্রসমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

শ্রীভূপতিমোহন সেন

প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছে যে পত্রিকার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্যবিচারের যোগ্যতার স্পর্ধাও রাখি না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা এত ভাবে বলেছে যে নতুন কিছু নতুন ভাবে বলা অসম্ভব। যাই বলা যাক তা কারুর না কারুর কথার পুনরুক্তি হতেই হবে। সেক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে একটা বিষয় বেছে নিয়েছি যেটা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। আধুনিক ছাত্রসমাজের কাছে হয়তো কিছু চিন্তার খোরাক যোগাবে। বিষয়টা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছাত্রসমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে খানিকটা জীবনস্মৃতির মতই শোনাবে। আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করবেন।

কবির ছেলেবেলাকার রচনা অনেক সমালোচকের তীক্ষ্ণবাণের লক্ষ্য হয়েছিল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের মত ধুরন্ধর সমালোচক সেই লেখাতে প্রতিভার নিদর্শন পেয়ে কবিকে আদর আন্তরিকতার সহিত স্বাগত জানিয়েছিলেন, তবু বিরূপ সমালোচকের অভাব ছিল না। তাদের দু চারটে পংক্তি হয়তো এখনকার পাঠকদের কাছে মজার মনে হবে। একজন লিখেছিলেন—

থাক্ রে থাক্ পায়রা কবি
খোপের মধ্যে থাক ঢাকা
তোর বকবকানি ফোঁস্‌ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাবমাখা
তাও ছাপালি গ্রন্থ হ'ল
নগদ মূল্য এক টাকা।

এইজাতীয় সমালোচকদের উদ্দেশেই কবি লিখেছিলেন নিন্দুকের প্রতি নিবেদন—

হউক্ ধন্য তোমার যশ, লেখনী ধন্য হোক্।

বোঝা যায় এসব ঠাট্টা-তামাসা কবির sensitive (বাংলা কি স্পর্শকাতর?) মনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল।

পরে যখন পরিণত বয়সের কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল তখন দু'চারজন সমালোচক দেখা দিলেন যাঁরা কবিকে অস্পষ্ট ও কবিতাকে হেঁয়ালী বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এদের বক্তব্য ছিল যে ইংরেজ কবি Keats, Shelley প্রভৃতির কবিতার অর্থগ্রহণে

কষ্ট হয় না, অথচ একজন স্বদেশী কবির লেখা বুঝতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। জীবনস্মৃতিতে কবি তাঁর প্রথম কবিতা—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে

সম্পর্কে বলেছিলেন যে যদিও অস্পষ্ট বলে তাঁর একটা অখ্যাতি আছে, তবু এ কবিতা জলের মত স্বচ্ছ। এটা সে অভিযোগের জবাব। একজন সমালোচক 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতা বুঝতে পারেন নি, আর অসংখ্য প্রাকৃতিক অসম্ভাব্যতার উল্লেখ করেন। যথা শ্রাবণের মেঘ গগনে ঘোরাফেরা করে না, কৃষক ধান কেটে তীরে একা বসে থাকে না বিনা ভরসায়। সে আনন্দে ও উল্লাসে ধান বাড়ী নিয়ে তোলে। তার পর অজানা অচেনা মাঝির নৌকায় ধান তুলে দিয়ে নিজে পড়ে থাকে না, ইত্যাদি। এই সমালোচনার পাল্টা জবাব অন্য একজন দিয়েছিলেন—সবচেয়ে গোড়ার গলদ যে সোনার নৌকা কখনও হয় না, কেউ দেখে নি। এই সমালোচক একটা কবিতার প্রশংসা করেছিলেন, সেটা হচ্ছে 'যেতে নাহি দিব'। কারণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন যে এতে প্রথমে আছে ঘটনার বিবৃতি। দুয়ারে গাড়ী প্রস্তুত, মালপত্র বাঁধা হয়েছে, যাত্রার সব আয়োজন পূর্ণ। যা তোমার আমার সকলের জীবনেই ঘটে। তার পর বিদায়ের পালা, ছোট্ট মেয়ের একটি কথা 'যেতে নাহি দিব'। তার পর কবির চিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সমালোচক মহাশয়—যেন একটা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা!

যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক কবির প্রতিভা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তবু এ শ্রেণীর সমালোচকের অভাব ছিল না। এরকম সমালোচনার ব্যথা যা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা ফুটে বেরুল—Nobel প্রাইজ পাবার পর কলিকাতা থেকে দল বেঁধে সাহিত্যিক ও অন্যান্য অনেকে যখন কবিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়াছিলেন। শোনা যায় এই দলে পূর্বোক্ত দলের কয়েকজন পাণ্ডাও ছিলেন। কবি নোবেল পুরস্কার পেতেই এঁদের মতামত রাতারাতি বদলে গেল।

দেশের শিক্ষিত মহলে কবির প্রভাব বিস্তার হতে যে সময় লেগেছিল তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। কবির যে কালো মাটির বাসার উপর আন্তরিক টান ছিল সেটা তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজের বোধগম্যই হয় নি। আগেকার যুগে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা হয় কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মত দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, গল্পাংশটা নেহাৎ ধারক মাত্র, অথবা বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণলীলা ছিল তাঁদের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন—

সত্য করি কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে ?

মানসচক্ষে দেখতে পাওয়া যায় যে এই কবিতা শুনে ভক্ত বৈষ্ণবরা কানে আঙ্গুল দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু দুর্বোধ্য ছিলেন তা নয়, তাঁর কবিতা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট ছিল। আর বাংলা দেশের পাঠকসমাজ মূঢ় চকিত না হয়ে পারে নি।

শঙ্করাচার্যের পর হতে আমাদের দেশে জীবনের গভীর কথা যিনিই বলেছেন, তাঁর প্রথম কথাই হয়েছে কামিনীকাঞ্চনত্যাগ, এটাই মানুষের চরম কর্তব্য। কামিনী হল ছলনাময়ী প্রকৃতির দূতীমাত্র যার একমাত্র কাজ হচ্ছে পুরুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়া। সে স্থলে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন—

মানসী রূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য সাথে যাও মিলে মিশে

তখন সাধারণ পাঠকসমাজ এটাকে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি। আর কাঞ্চন তো কেবল সোনা নয়। সে তো অর্থ—জীবনধারণের উপায়। শরীরশাস্ত্রবিদগণ বলেন যে বেঁচে থাকতে হলে হয় নিজের নয় পরের শ্রমে উৎপন্ন দিনে ১৫০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য দরকার। কবি নিজে জমিদারী শাসন করতেন। সুতরাং তিনি যদি কাউকে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন তবে সেটা অনধিকারচর্চাই বলতে হবে। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এটা আত্মদোষস্খালনের ব্যর্থ প্রয়াস বলেই ধরা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কবির একদল ভক্তের আবির্ভাব হয়। মনে আছে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে একটা রবীন্দ্রসমিতি ছিল যেখানে সপ্তাহে একদিন রবীন্দ্রকাব্যচর্চা হ'ত। কলিকাতায় কোন সভায় রবীন্দ্রনাথ আসবেন জানা গেলে, হল ভর্তি হয়ে যেত। বক্তৃতা শেষ হলে চিৎকার উঠত—গান, গান! মনে হয় "আমায় গাহিতে বোলো না" এ রকম কোন সভায় রচিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া হয়।

আমার মনে হয় কবির সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিকট পরিচিতি স্বদেশী যুগ থেকে। তখনকার রচিত অনেক গান "বাংলার মাটি বাংলার জল", "আমার সোনার বাংলা", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" লোকের মুখে সমস্ত বাংলাদেশ ছেয়ে গেছিল। পথে ঘাটে লোকালয়ে সাধারণ লোকের মুখে এসব গান শোনা যেত।

গল্প আছে নজরুল ইসলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পরিহাস করে বলেছিলেন, আপনাকে আমি খুন করব। কবি ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন ? উত্তরে নজরুল বলেছিলেন যে, যাই লিখতে যাই, তাই দেখি আপনি আগে লিখে ফেলেছেন। আপনি ভবিষ্যতের কবিদের জন্য কোন জায়গা ফাঁক রাখেন নি। কথাটা লঘুভাবে

বলা হলেও অনেকাংশে সত্য। তিনি কিশোরদের জন্য লিখেছেন 'যখন হব বাবার মত বড়', 'বীর পুরুষ'। আমার মনে আছে আমার রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—

কোশল নৃপতির তুলনা নাই
জগৎ জুড়ে যশোগাথা
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাঁই
দীনের তিনি পিতামাতা।

শেষের ক'টি ছত্র শুধু বর্মাচ্ছাদিত দ্বারীর চোখে জল আনে নি, একটি তরুণ পাঠকেরও চোখ ছলছল করে উঠেছিল। তিনি উর্বশীর স্তুতি করে লিখেছেন—

মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল
তোমার মদির গন্ধে অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে।

আর অন্যদিকে, সাঁওতালী বালিকাকে লক্ষ্য করে—

কাল? সে যতই কাল হোক্
দেখেছি তার কাল হরিণ চোখ।

হাস্যরসের কবিতা অনেক লিখেছেন—

মোক্ষমূলর বলেছে আর্য
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে।

ব্যঙ্গের ভিতর অন্তরের ব্যথা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র ও হিমাচলের উপর কবিতা লিখেছেন। আর অন্যদিকে লিখেছেন ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুর উপর—যে ছোট্ট কবিতাটি হীরের টুকরোর মত জ্বলজ্বল করছে। নিছক হাস্যরসের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'চিরকুমার সভা' ও 'গোড়ায় গলদ' অতুলনীয়। প্রেমের কবিতা তো অজস্র। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর শুচিবাই না থাকলেও শুচিতা আছে যার জন্য তাঁর প্রেম একটু দূরত্ব রেখে চলেছে—"সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর" ধরনের।

কবির বিভিন্ন moodএ (বাংলা কি?) রচিত কবিতার বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। "অমল ধবল পালে", "আমি চঞ্চল হে" ইত্যাদি কবিতাতে শুধু রঙীন ভাবুকতা নেই, সঙ্গে আছে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়ের আভাস ও ব্যঞ্জনা। প্রবন্ধের আয়তন আর বড় করবার দরকার নেই। সব কথা গুছিয়ে বলতে গেলে তাঁর সমগ্র রচনাবলী থেকেই উদ্ধৃতি দিতে হয়।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানা স্থানে দেশে বিদেশে নানা আয়োজন হয়েছে। গানে, অভিনয়ে ও বক্তৃতায় সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছে কিন্তু আমার মনে হয় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের দেশে উপনিষদকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা সাধারণ মানুষ মন্ত্রের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ পাই না, সেগুলি শুধু আবৃত্তিই করি। কিন্তু কবির শান্তিনিকেতনে সেগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। যে ভাষায় কবি ব্যাখ্যান দিয়েছেন তা এত কবিত্বপূর্ণ যে তা সহজেই মরমে পৌঁছায়। অথচ কোন সাম্প্রদায়িক মতামতের উল্লেখমাত্র নেই। তিনি সংশয়ের আবেগকে সাদরে আহ্বান করে জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন যে এই ধর্ম অদ্ভুত অসঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে যে, পরমাত্মা নিজেকে মানুষের কাছে বাঁধা রেখেছেন। শিবকে কল্যাণকরকে প্রণাম জানিয়েছেন, অন্যদিকে অপ্রিয় বিরস তিক্ত চিত্তপাবনকে অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বমানবিকতার কথা অনেক বক্তৃতামঞ্চ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। হিংসায় উন্মত্ত মানব-সমাজের উপর তার কি প্রভাব হয়েছে তা বলা শক্ত। অনুমান হয় যে যেখানে বুদ্ধদেব ও যীশুর বাণী ও উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বাণী হয়তো সেই পথেই যাবে। কিন্তু আমরা তাঁর অতি সাধারণ স্বদেশবাসী যদি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অংশ পাই তা হলে এ উৎসব ব্যর্থ হবে না। জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই জীবনের অর্থ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। যাঁরা জীবনের পরশপাথরের সন্ধান পেতে চান, হয়তো তাঁরা কবির শান্তিনিকেতনে তার কিছু নির্দেশ পেতে পারেন।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের সময় এখানকার ছাত্রদের মধ্যে একটা কথা চালু ছিল—everybody who is anybody, সে এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

অন্য কলেজের ছাত্ররা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে ওই উক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা করত। এ কলেজের ছাত্ররা প্রত্যুত্তরে জানাত যে ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এখানকার ছাত্ররা একেবারে মুষড়ে পড়ত যখন প্রতিপক্ষ রবীন্দ্রনাথের কথা তুলত।

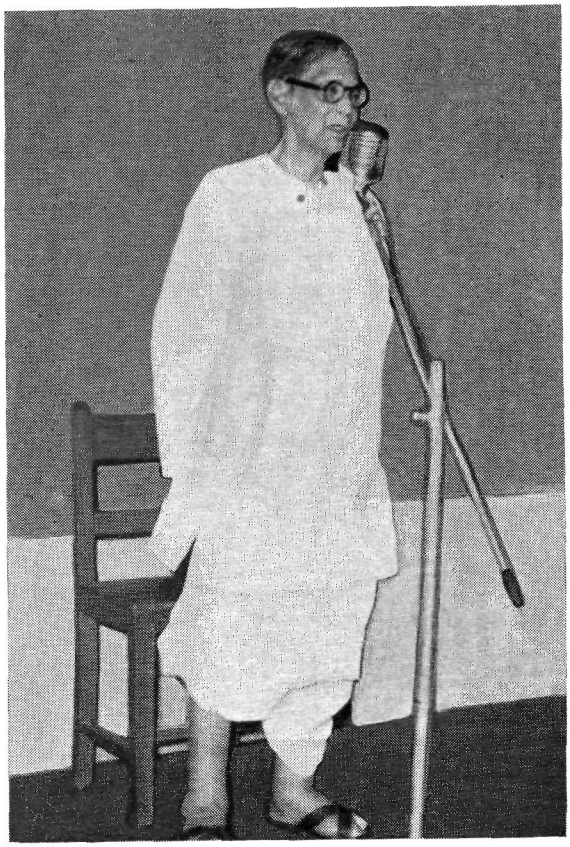

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম—২৯শে বৈশাখ, ১২৯১ মৃত্যু—৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৭

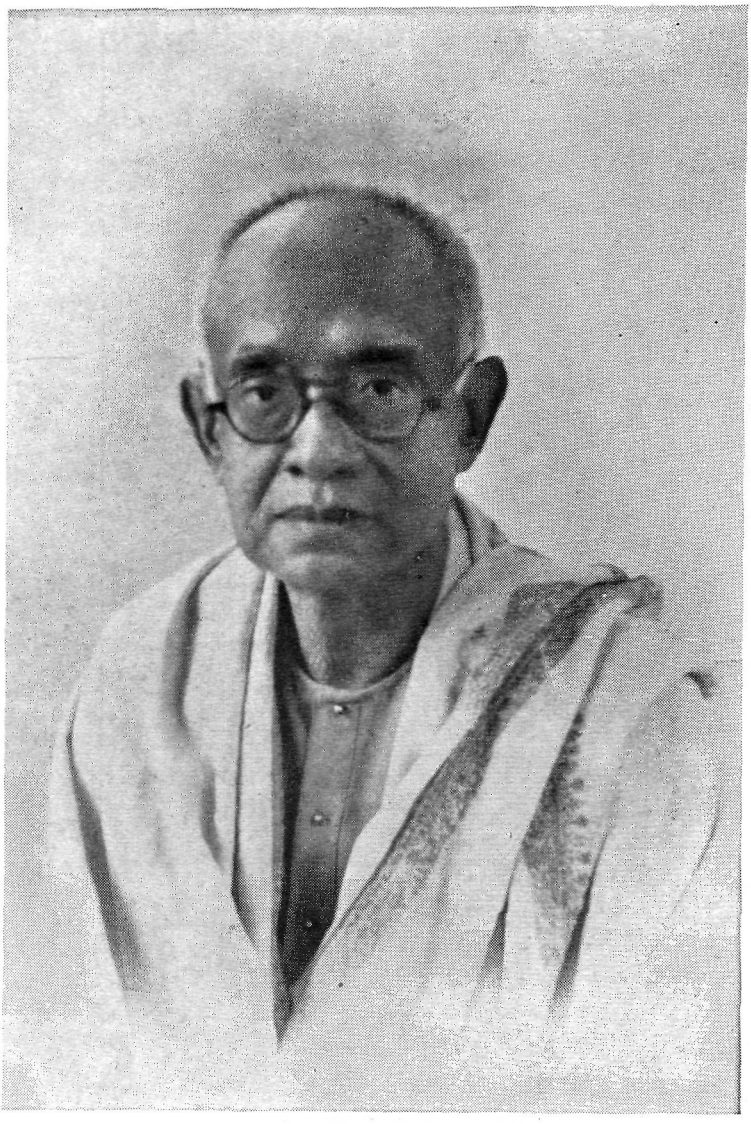

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম—২৯শে জুন, ১৮৮৩

মৃত্যু—২৬শে আগস্ট, ১৯৬১

['বসুধারা'র সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাথ যে কেওকেটা নন এ কথা মানতেই হবে, আর যিনি শৈশবেই স্কুল খতম করেছিলেন তাঁর পক্ষে কলেজে পড়ার কথাই ওঠে না। এত বড়ো ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে মূল নিয়মটাকে আর নিয়ম বলা চলে না, ওটা অগ্রাহ্য।

কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মুহ্যমান হতে হবে না। রবীন্দ্রনাথ আদৌ ব্যতিক্রম নন। তিনি এই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন।

কি করে তা হবে? তিনি তো এণ্ট্রান্স পাস করেন নি। সেই কথা বলি।

এখন যেমন marksheet থেকে নম্বরগুলি সাজিয়ে একটা লাইন টেনে বলে দেওয়া হয়, এর নীচে আর নেওয়া হবে না, তখনকার দিনে সেরকম ছিল না। বর্ধিষ্ণু ঘরের লোক, যাঁদের ছেলেরা ঘরে পড়াশুনা করেছে বা করে নি, তাঁরা ওই ছেলেদের কিছুটা বিদ্যা, কতকটা সহবৎ শেখার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠাতেন। তাদের মধ্যে দু'এক জনকে বহিরঙ্গ ছাত্র, external student, রূপে নেওয়া হত।

এইভাবে এলেন রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কত দিন পড়েছিলেন? আমাদের বলতে লজ্জা করছে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলাম।"

এখন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তিনি ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখেছেন, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস; তিনি নিজে বহুদিন স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়িতে কি-না-কি পড়েন।

অন্যদিকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসুর পুত্র জগদীশচন্দ্র বসু এই সময় সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ছাত্র, বি. এ. পড়েন। জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ কেউ কারুকে চেনেন না, জানেন না, জানবার কথাও নয়।

কয়েক বছর চলে গেল। জগদীশচন্দ্র বিলাত গিয়ে সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন। এর কিছু আগে হার্জ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। জগদীশচন্দ্র হার্জের উদ্ভাবিত যন্ত্র ছাত্রদের দেখান, তা নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা করতে করতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সে সম্বন্ধে অনেক কাজ বাকি রয়েছে। তিনি নতুন ধরনের যন্ত্র নির্মাণ ক'রে তা দিয়ে বিবিধ পরীক্ষা ক'রে বহু অজ্ঞাত বিষয়ে আলোকপাত করতে থাকলেন। তাঁর ওই আবিষ্কারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্র হতে জগদীশচন্দ্রের কীর্তিকলাপের কথা অবগত হলেন, তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নাই চেনা থাক, তিনি স্থির করলেন, উপযাচক হয়ে একদিন জগদীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। গেলেন একদিন জগদীশচন্দ্রের বাড়ি, হাতে নিয়ে একগুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া। কিন্তু কি দুর্দৈব, গিয়ে শুনলেন, জগদীশচন্দ্র বাড়িতে নেই। কি করবেন! শেষে আস্তে আস্তে ফুলগুলি জগদীশচন্দ্রের টেবিলের উপর রেখে বাড়ি ফিরলেন।

এখন সূত্রপাত হল দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে, পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির-স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে।"

১৮৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা' কাব্যগ্রন্থ জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে লিখলেন—

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস করেন, আর প্রতি উইক-এণ্ড জগদীশচন্দ্র সেখানে কাটিয়ে আসেন। এর কিছু আগে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। হিতবাদীর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে ছোটো গল্প লিখে চলেছেন। কয়েকটি প্রকাশিত হবার পর হিতবাদীর কর্মকর্তারা তাঁকে জানালেন যে গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ হাত গুটালেন।

আজ বাঙালী পাঠক একথা জেনেছে যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সমালোচক বলেন,—কাব্যে ঊর্ধ্বলোকে যখন তিনি উঠে গিয়েছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে তাঁর নাগাল পায় নি। কিন্তু এই ছোটো গল্পে তিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসে আমাদের অতিপরিচিত মাটির জগতে পা দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছ শেষ ক'রে বাঙালী পাঠক মনে করে, নদনদীতে ঘেরা সবুজে ভরা সমস্ত বাংলা দেশটাকে পরিক্রমা করে এলুম। আর রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমের গদ্যরীতি টেনে না এনে ছোটো গল্পে তিনি এক নতুন গদ্যরচনা সৃষ্টি ক'রে সাহিত্যের দু'কূল ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর ওই ভাষা থেকেই বর্তমান যুগের সাহিত্যিকরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের নিজের সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তুলছেন।

বাঙালী এই অমূল্য সাহিত্যের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হত যদি-না একজন বিজ্ঞানীর চেষ্টা তাকে পুনরুজ্জীবিত করত।

রবীন্দ্রনাথ বললেন,—প্রতি উইক-এণ্ডে তোমার এখানে আসা চাই।

জগদীশচন্দ্র উত্তর দিলেন,—আসব, যদি তুমি প্রতি সপ্তাহে একটা ক'রে নতুন গল্প লিখে তা পড়ে শোনাও।

দুই বন্ধু চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

এই সময়কার আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাক। জগদীশচন্দ্র এক পত্রে লিখেছেন—

"একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবন ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রামে সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক সময় মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহৎ, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

ইহার ফলে দেখা দিল—কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ।

এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আগমনের কথায় আসা যাক। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে; বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত; জগদীশচন্দ্র তাঁর নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন, পরীক্ষা দেখাবেন। জগদীশচন্দ্রের পরম সুহৃৎ রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত। হঠাৎ সেই সভায় এলেন ত্রিপুরার মহারাজা, একেবারে অনিমন্ত্রিত। তাঁকে চেনেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে সমাদর করে তাঁকে বসালেন।

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে মহারাজা মুগ্ধ হলেন।

এই সময় পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত কয়েকটি পরীক্ষা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন, যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যাবেন আর সেখানে তাঁদের পরীক্ষাগুলি দেখাবেন। উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল, কিন্তু টাকার অভাব প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট থাকলেন না। তিনি ত্রিপুরার মহারাজাকে লিখলেন—

"জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ, আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি—আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট

একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।...আমি মহারাজের নির্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী—আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ-দ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিবারবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের নিকট আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জনা করিবেন এবং আমাকে ব্যক্তি হিসাবে মার্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।"

মহারাজের কাছ থেকে অর্থ এল। টাকাটা নিতে জগদীশচন্দ্র ইতস্ততঃ করছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—

"মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থ-সাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।"

জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে গেলেন।

সেখানে জগদীশচন্দ্র নানা কাজে ব্যস্ত; কিন্তু দুই বন্ধুর মধ্যে নিয়মিত পত্রচলাচল হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটো গল্প অনুবাদ করিয়ে জগদীশচন্দ্র সেখানে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

"এদেশে এমন লোক আজকাল অধিক মাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিং গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত যোগাইতেছি :—

প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা—সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। 'ছুটী' শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

দ্বিতীয়। Typical John Bull। 'ছুটী' শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না—ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে; এরূপ দু-একজনকে আমি জানি—true to life। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

তৃতীয়। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়—ইউরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European Literature।

সুতরাং সাধারণের নিকট কি রকম লাগিবে জানি না।

কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখানকার একজন publisherএর নিকট পাঠাইতে চাই। অনেক দরদস্তুর করিতে হইবে।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎসমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাংলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মতো সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যে ঐ বড়ো মুস্কিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়পরিজনের কাছে সে যেভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ, জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন রাখে না। ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।"

সেই সময় রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবে না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড়ো কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে উৎসব নিরানন্দ হইবে।"

জগদীশচন্দ্র লিখলেন,—

"তোমার মিনির বিবাহ। কাবুলিওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে।"

আর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে—যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না—তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি ধোঁয়া দিয়া থাকে—তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের।"

জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন, দুই বন্ধুর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ চিঠি লেখালেখি চলতে লাগল।

১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের

ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মরলিরও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।"

১৯শে নভেম্বর ১৯১৩ সাল। রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাবার সংবাদ এসে গেছে। জগদীশচন্দ্র লিখছেন—

"বন্ধু,

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চিরসহায় হউন।

তোমার

জগদীশ"

২৩শে নভেম্বর কলকাতা হতে স্পেশাল ট্রেনে পাঁচশ লোক শান্তিনিকেতনে গেলেন রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে।

শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে উৎসব হল; সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর বক্তৃতার শেষে জগদীশচন্দ্র বললেন,—তোমার লেখা বহুদিন থেকে আমাদের বন্দী ক'রে রেখেছে, আজ বন্দী তোমার জয়গান করছে।

এই উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্র সম্ভবত নিজ সাধনার প্রতীকস্বরূপ ছোটো মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন।

এই দুই মহাজ্ঞানীকে আমরা পাশাপাশি দেখলুম এর চার বৎসর পরে এক সভায়। দেশের রাজনীতি খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ সরকার অ্যানি বেশাণ্ট ও তাঁর দুই সহকর্মীকে অন্তরীণ করেছে। এর প্রতিবাদে সভা করতে হবে। টাউন হল স্থির করা হল। সভা যেদিন হবার কথা তার তিন দিন আগে বাংলা সরকার জানালেন যে টাউন হল একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, সেখানে ওই সভা হতে পারবে না। শেষে রামমোহন লাইব্রেরি স্থির হল, রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করলেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন জগদীশচন্দ্র।

১৯১৭ সালে ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন হল। সেদিনকার আবাহনে রবীন্দ্রনাথের এই সংগীত মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধ্বনিত করল—

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে

বরপুত্রসঙ্ঘ বিরাজ হে
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।"

১৯২৮ সালে ১লা ডিসেম্বর জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন—

"তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম মাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা।"

জগদীশচন্দ্র বাংলায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারই একটি সংকলন 'অব্যক্ত' নামে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই পত্রখানি পাঠান—

"৩রা অগ্রহায়ণ
১৩২৮

বন্ধু,

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"বন্ধু

তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-পরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেকবারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

তোমার
রবি"

রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্য কি প্রগাঢ় ছিল অবলা বসু মহোদয়ার এক পত্র হ'তে তা বোঝা যায়। তিনি লিখছেন—

"জীবনের শেষ বৎসরও উনি (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর— "আজি হতে শতবর্ষ পরে" শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

শান্তিনিকেতন

প্রবাসজীবন চৌধুরী

১৯৪৫ সাল। বসন্তপূর্ণিমার আর দুদিন বাকী। ভোরবেলায় পশ্চিম থেকে লুপ প্যাসেঞ্জারে বোলপুর স্টেশনে পৌছলাম। স্টেশনের বাইরে তখন কেবল কয়েকখানি গরুর গাড়ী পেলাম। তাই একটা ভাড়া করলাম। কাঁচা রাস্তা, এক-পা ধুলোর মধ্যে গাড়ীর চাকা পুঁতে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা শম্বুক গতিতে চলে শান্তিনিকেতন পৌছলাম। সেখানে তখন আশ্রমবাসীদের সেদিনের জীবন সবে আরম্ভ হয়েছে। অতি মনোরম দৃশ্য। খালি পায়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করছে। চারদিকে নানা জাতির গাছপালা। মধু-মালতী ও শালফুলের গন্ধে আমোদিত সকালের শীতল স্নিগ্ধ বাতাস। মনে হল এতদিনে বুঝি মনের মত জায়গা পেলাম। এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। এখানে তিনি আজ নেই বটে তবে তাঁর আদর্শ, তাঁর স্বপ্ন তো এখানকার আকাশে বাতাসে ছেয়ে আছে। কারা যেন গাইছে,

"মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের কুসুমখানি
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি।"

গরুর গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গেলাম যেদিক দিয়ে গান আসছিল। দেখলাম একটি সুন্দর ভবনের বারান্দার সামনে প্রাঙ্গণে সারি সারি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা দাঁড়িয়ে আছেন ও একদল ছাত্রছাত্রী গান কবছে। চারদিকে সৌম্য শান্তি। এই রকম অধ্যাত্মপূর্ণ পরিবেশের কথা আগে কল্পনাও করিনি।

অতিথিশালায় মালপত্র রেখে একটু পরেই শিক্ষাভবনে এলাম অনিলকুমার চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনিই আমায় আসতে

অনুরোধ করে তার করেছিলেন। মনে নানা রকম ভাবনা ছিল, কী জানি এই মানুষটি কেমন হবেন। তখনকার দিনে অধ্যাপকের জীবনে অনেক রকম অভিজ্ঞতাই হোত। অধ্যাপনা কার্যের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও সমাজসেবার সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ এই সব ভাবের পরিবর্তে চাকরীলাভ ও বেতনপত্রের অনুষঙ্গই প্রধান ছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেখে ও তাঁর সঙ্গে দু-একটি কথা হতেই আমার মনের অশান্তি কেটে গেল। দেখলাম এখানে চাকরী করতে ঠিক আসিনি; আরো কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কাজ আমার আছে। তাঁর সমস্ত কথাতেই রাজী হলাম। অন্যান্য কথার মধ্যে যেটি প্রথমটা আমায় একটু চিন্তায় ফেলেছিল সেটি এই যে, তিনি বললেন—রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষকদের মধ্যে 'তারুণ্য'। ছাত্রছাত্রীদের নিজের ভাইবোনের মত দেখতে হবে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করা বাঞ্ছনীয়। তখন আমার বয়স উনত্রিশ এবং এর পূর্বে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা আমাকে ছাত্রছাত্রীদের থেকে তফাতে থাকতেই শিখিয়েছিল। যাই হোক স্থির হল একমাসকাল সময় আমি দেখব এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি কিনা।

প্রথমে ক'দিন একটু অসুবিধে হয়েছিল। আমায় 'স্যার' না বলে একেবারে "প্রবাসদা" বলে ছাত্রছাত্রীরা সম্বোধন করায় ও আমায় তাদের নানা খেলাধুলায় যোগদান করতে হওয়ায় একটু অস্বস্তি হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনেই এসব স্বাভাবিক হয়ে যায়। অধ্যক্ষ মহাশয় কখন যে আমার 'অনিলদা' হয়ে গেলেন ও তিনি আমায় নাম ধরে ও 'তুমি' বলে কথা বলতে লাগলেন তা বুঝতেই পারলাম না। অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে দাদা ও ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরি হল না।

একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে এসে পড়লাম। সকলের মধ্যেই প্রবাহিত ছিল একই প্রাণ। আমরা যেন মনে মনে সর্বদাই স্মরণ করছি যে আমরা শান্তিনিকেতনে আছি, আমাদের কাজ-কর্ম আমোদ-প্রমোদ সমস্ত ঘিরে আছে একটি আদর্শকে, মহর্ষির সাধনা-ক্ষেত্র, কবিগুরুর স্বপ্নভূমি এই শান্তিনিকেতনের আদর্শ। সেটি কী? ভাষায় নানাভাবে তা বলা হলেও তার সম্পূর্ণ সহজ ভাবটি ধরতে হবে জীবন দিয়ে, একটি সরল বোধের মধ্য দিয়ে। মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে আছে একটি সমগ্র মনুষ্যত্ব যা জানে না কোন অন্ধ সংস্কারের বাধা, মানুষে মানুষে দেশকাল আচার-ব্যবহারের সহস্র বেড়াজাল, যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব যেখানে মানুষের সকল ক্ষমতাই—তার জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তি ও শিল্পবোধ—এক সঙ্গে প্রকাশ পায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐকতানরূপে। এই আদর্শটি সঙ্গীতের সুরের মত, প্রকৃতির আলো-বাতাসের মত অন্তরে প্রবেশ করবে, কারণ এ যে অন্তরের নিজস্ব ধর্ম, তার মর্ম সত্য। সকালেই বৈতালিকের গানে সমস্ত দিনের সুরটি যেন ধরিয়ে দেয়, হৃদয়-বীণাটি যেন সেই সুরে বাঁধা হয়ে যায়। "মোরে ডাকি লয়ে যাও, মুক্ত দ্বারে", "তোমার বিশ্বের সভাতে" বা

"আলোকেরই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও। আপনারে এই লুকিয়ে রাখা, ধূলায় ঢাকা, ধুইয়ে দাও"—এই রকম নিত্যনূতন গান প্রতি প্রভাতে শুনি আর মনে হয় এ সবই একটি পরম গান বা মন্ত্রের নানারূপ প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির ও বিশ্বচেতনার গভীর একটি যোগের আভাসে চিত্ত ভরপূর হয়ে থাকে।

যাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁদের মধ্যেও একটি প্রসন্নচিত্ততা, একটি স্নিগ্ধ জীবনবোধ পাই। ভুবনডাঙ্গা থেকে প্রভাতদা আসেন। খালি পায়ে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই তিনি পায়ে হেঁটে আসেন গ্রামপথ দিয়ে। সারাদিন লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পড়াশুনা ও বইলেখায় ব্যস্ত থাকেন। অথচ যখনই তাঁর কাছে যাই নানারকম আলোচনায় তিনি প্রলুব্ধ করেন। অপরের ভাবনাকে চমকে দিয়ে নানা দিকে ধাবিত করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ওঁরই মত খালি পায়ে আসেন ক্ষিতিদাদু, একটি থলিতে বইপত্র নিয়ে। লাইব্রেরীর ওপরতলায় বিদ্যাভবনে নিজের ঘরে ডেস্কোটির ওপর বইপত্র রেখে সারাদিনই নিবিষ্টমনে লেখাপড়া করেন তিনি। অথচ যখনই কাছে গেছি এমন ভাব যেন তিনি এমন কিছুই দরকারী কাজ করছিলেন না। অতি স্নেহ ও আগ্রহের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন ও আমার কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর নির্দেশ করতেন। কথায় কথায় দাদু কবীর ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় ভক্ত সাধকদের হিন্দি দোঁহা ও বাঙলার বাউলদের গান আবৃত্তি করে মনকে মুহূর্তে দেখিয়ে দিতেন এক অসীম উন্মুক্ত আকাশ। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুনতাম তাঁর কাছ থেকে তাঁর পর্যটক জীবনের কত বিচিত্র কাহিনী। কত সহজ মানুষ ইনি। আবার এঁর কাছ থেকেই শুনি মন্দিরে প্রার্থনাসভায় প্রতি বুধবার সকালে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ। রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের এক একটি দিককে যেন জীবন্ত ধরে রেখেছেন শান্তিনিকেতনের কয়েকটি মানুষ। এইরকম আর একজন, মাস্টারমশাই (নন্দলাল বসু)। বিকেলে চা-চক্রে প্রথম দিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা এবং আলাপ। সেই দিনই তিনি আমায় আপন করে নেন। যেন কত আগে থেকেই আমায় জানেন এমন ভাবেই তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। সহজ সুন্দর মানুষটি। প্রত্যেকদিনই চা-চক্রে আসতেন; গরমের দিনে পড়ন্ত সূর্যের প্রখর রোদ থেকে মাথাটি বাঁচাতেন তাঁর কাঁধের চাদরটি দিয়ে। চা-চক্রে শান্তিনিকেতনের সকল বয়সের সকল পদের লোকের সমাগম হত। কিন্তু আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাসের সময় এই পার্থক্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত থাকত। সেখানে কতদিন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করেছি শিল্পকলা নিয়েই। প্রত্যেকের মতামতের স্বাধীনতাকে প্রত্যেকেই সম্মান করতেন; তাছাড়া সভ্যদের মধ্যে একটি মধুর আত্মীয়তাবোধ ছিল।

এইরকম একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কঠিন সাধনাকে সহজ আনন্দরূপে গ্রহণ করবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। মিথ্যা আড়ম্বর, আবার অহেতুক কৃচ্ছ্রসাধন, সকল রকম গোঁড়ামি, বিদ্যা, নীতি, ধর্ম বাড়াবাড়ি, গলাবাজি বা দলাদলি—

এ সমস্তই শান্তিনিকেতনে অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক বলে কৌতুকের বিষয় ছিল। জীবন ও তার ধারণাকে কোথাও থেমে যেতে দেওয়া কিম্বা তাকে কেবল কেতাবী বুদ্ধির সীমানায় আবদ্ধ করা স্থবিরতার লক্ষণ ; নিত্য স্রোতের মধ্যেই এদের সত্য পরিচয়, দৈনন্দিন কর্ম ও ব্যবহারের মধ্য দিয়েই এদের সম্যক প্রকাশ। সমস্ত কাজকর্ম, জ্ঞান ও ধর্মচর্চার মধ্যে একটি সজীব উন্মুখ চিত্তকে জাগিয়ে রাখতে হবে। যা শিখেছি, করেছি ও পেয়েছি এদের নিয়েই পরম তৃপ্ত হয়ে বসে না পড়ি। নতুনের সন্ধানে মনপ্রাণ যেন সর্বদাই এগিয়ে চলে। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" তারুণ্য বলতে কবিগুরু চিত্তের এই রকম একটি প্রাণচঞ্চল সাবলীল ভাবকে বুঝতেন যা মানুষের শিক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই তারুণ্যের বাহিরের রূপ, আচার-ব্যবহার, বেশভূষার সরলতা এবং সমস্তের মধ্যে একটি প্রসন্নচিত্ততা। একটি স্নিগ্ধ হাস্যরসবোধ দিয়ে জীবনের কর্তব্যকর্ম, অসংখ্য অপ্রীতিকর ব্যাপারকে মসৃণ ও সুশ্রী করে তোলা—এর মধ্যে কোনরূপ লঘুচিত্ততার স্থান নেই। কারণ এই তারুণ্যের একটি ভেতরকার রূপ আছে। সেখানে প্রত্যেকে তার জীবনের মূলমন্ত্রটি সাধনা করছেন। সকলেই নিজের আত্মপুরুষের সম্যক উপলব্ধির চেষ্টায় আছেন। "আপনাকে এই জানা আমার, ফুরাবে না, ফুরাবে না।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন এই পরিবেশ রচনা। এর জন্য চাই প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণ, ঋতুদের আনাগোনা যেখানে অন্তরে তোলে বিচিত্র সুর ; চাই একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন ও প্রেরণা মূর্তরূপে, কোন বিরাট ব্যক্তিপুরুষকে আশ্রয় করে ; চাই মানুষে মানুষে সত্যকার মিলনের ভাব যার গুণে ছাত্র ও শিক্ষকদের একত্রতা হতে গড়ে ওঠে কোন মহৎ কাজ বা আদর্শ। তা না হলে সেই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে হাট যেখানে ছাত্ররা আসে বিদ্যা বা ডিগ্রি কিনতে আর শিক্ষকেরা আসেন চাকরী করতে। আর চলে অন্তহীন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও কাদা নিক্ষেপ। শান্তিনিকেতন গিয়ে পেলাম কর্মী ও ছাত্র-সকলের কাছ থেকে অনাবিল ভালবাসা, সকলেই যেন বলছেন, "তুমি তো চাকরী করতে আসোনি, এসেছো আমাদের মধ্যে আশ্রমবাসী হয়ে। আমাদের এই 'সব হতে আপন' শান্তিনিকেতনে যে প্রাণের স্পন্দন, যে জীবনকাঠির স্পর্শ দিয়ে গেছেন কবিগুরু, তার সবটাই তুমি পাবে, আর আমরা আশা করি, তোমার জেগে ওঠা প্রাণ হতে আমরাও পাবো অনেক প্রীতির দান।" শান্তিনিকেতনে কর্মীদের মানবিক গুণাগুণ তাদের আদর্শ, ত্যাগ, সামাজিক কর্তব্যবোধ—এই সবের বিচারে মূল্যায়ন করা হয়, কেবল ডিগ্রী বা তাদের বিশেষ কোন দক্ষতা দিয়ে নয়। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই মানুষের আদর্শ, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সেই আদর্শ দ্বারাই যাচাই করতে হবে। একজন শিক্ষক ক্লাসে কতখানি পড়ালেন তার চেয়ে বড় কথা তাঁর নিজের উন্নত ব্যক্তিত্ব দিয়ে কতখানি প্রভাবিত করলেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের। মানুষ তৈরী করাই হল আসল কাজ, আর সব উপলক্ষ্য—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। একথা রবীন্দ্রনাথ ভাল করেই বুঝেছিলেন। দেশে

পণ্ডিতদের অভাব কোনদিনই ছিল না, তবু কেন দেশের এত দুঃখদুর্দশা, মানবীয় গুণ বা মূল্যগুলির এত অবহেলা, সমাজসংগঠনের, সামগ্রিক জীবনবোধের এত অভাব? কেন ভারতীয়দের মধ্যে প্রদেশ, ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার নিয়ে এত বিভেদ? একটি সর্ব-ভারতীয় সবল সুস্থ উদার মানসিকতার প্রয়োজন আমাদের সর্বাগ্রে, তাই শিক্ষার প্রথম আবশ্যকীয় বস্তু হচ্ছে মানবতাবোধের সঞ্চার করা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

সুতরাং শুধু ছাত্র পড়িয়েই কর্তব্য শেষ হয় না আমার। বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য এই তিনটি বিষয়ই নিয়মিত পড়াই। সপ্তাহে চব্বিশটি ক্লাস করি, তা ছাড়াও বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রী এসে নানা বিষয় বুঝে যায়। তবু মনে হয় আমি শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া হতে যা পাচ্ছি তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারছি না। ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের সঙ্গে কতভাবে মেলামেশা। প্রায়ই বনভোজ, কোপাই নদীর ধারে বা পারুল বনে বা চীপ সাহেবের কুটীর ভগ্নাবশেষের কাছে আমবাগানে—কত গান, আলাপ-আলোচনা, খেলাধুলা। কত আমোদভ্রমণ, ভীমবাঁধ, রোহটাসগড় তাঁবুতে বাস, অনেকগুলি প্রাণের সম্মেলনে এক অপূর্ব সাহিত্যরচনা আগুনের চারপাশে তারাভরা হিমেল বিদেশী আকাশের নীচে। এসবের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা সবার অলক্ষ্যে প্রত্যেকে অব্যবহিতভাবে পায় তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়।

কবিগুরুর আদর্শই সবার মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছিল। সকালে গাছের তলায় বসে পড়াচ্ছেন শিক্ষক, মাটিতে আসন পেতে গোল হয়ে বসেছে ছাত্রছাত্রীরা। ওদিকে কলাভবন ও সঙ্গীতভবনেও কাজ চলছে। নিজের ক্লাস শেষ করেই ছুটতাম কোন কোন দিন কলাভবনে, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করতাম ছবি নিয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে। দেখতাম কত দেশী বিদেশী ছবি। সপ্তাহে দুদিন ছিল শিক্ষকদের জন্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষার ক্লাস। পালিত মহাশয়ের ক্লাসে ছুটতাম বেলা তিনটে নাগাদ। নিজের লেখাপড়া তো আছেই। যখন যা বইয়ের প্রয়োজন হয় প্রভাতদা, অনিলদা ও বাগচী মহাশয়কে গিয়ে বলি, ব্যবস্থা হয়েই যায়। জানতাম বই আর পত্রিকার পাহাড় করলেই জ্ঞান হয় না। চাই ধ্যান। উপকরণের মায়া সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এর মধ্যে আসেন অবনদাদু। প্রত্যহ বিকেলে তাঁর কাছে গিয়ে বসি। কত কথাই বলেন। একদিন কথায় কথায় বললেন, "তোমরা তো এটাকে ইস্কুল বানিয়ে ফেলেছ হে! রবিকাকার ঠিক সে ইচ্ছে ছিল না। আমার কী মনে হয় জানো? তোমরা মাস্টাররা যে যার বাড়ীতে মাদুর পেতে জোরসে পড়াশুনা লাগিয়েছ ভোর থেকে। ছেলেরা যাবে পড়তে। তুমি বলবে 'যাও, আজ হবে না। নিজে নিজে যা পারো পড়ো, আজ আমি ভীষণ ঝামেলায় পড়ে আছি।' ওরা ফিরে যায়। ঘণ্টা নেই, তাড়া নেই, চলছে নীরবে সাধনা। ছেলেরা দেখবে মাস্টারমশাই রীতিমত তপস্যা করছেন রাতদিন, তার ছোঁয়াচ ওদের লাগবেই।" কী অপূর্ব ছবি! অবনদাদুর ছবি

আঁকাও দেখেছি বসে বসে কত দিন। ছবি তিনি এক অর্থে আঁকতেন না, ছবি যেন বেরিয়ে আসতো আবছাভাবে কাগজ থেকে।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবনে (কলেজে) পড়াবার ও পরীক্ষার পদ্ধতি ভারতের অন্যান্য জায়গার মতই। এই পদ্ধতির অনিবার্য ও প্রত্যক্ষ দোষগুলি তাই শান্তিনিকেতনে কিছুটা বিদ্যমান। তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই এখন। কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে এর চেয়ে উন্নত কিছুর প্রবর্তন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে। বাঁধাধরা পাঠ্যসূচী ধরে পড়িয়ে যাওয়া এবং দুই বৎসর পরে অপর ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া। যে শিক্ষক পড়াচ্ছেন তাঁর কাজ যান্ত্রিকভাবে বক্তৃতা করে যাওয়া। ছাত্রছাত্রীরা এই বক্তৃতা থেকে খুব লাভবান হয় না, কারণ প্রথমতঃ তারা পড়ে আসে না, ক্লাসে আলোচনারও তাই কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রিক এই পড়াশুনা। ছাত্রছাত্রীরা জানে পরীক্ষার এখন অনেক দেরি, এবং পরীক্ষার জন্য কী কী বিষয় বেশী দরকারী এবং সেগুলি কী ভাবে লিখতে হবে তা এই বক্তৃতা থেকে তেমন জানা যাবে না। সেজন্য কিছু অধ্যাপক ছাত্রদের উপকার করার জন্য নোট দেন, যাতে বই পড়ারও প্রয়োজনীয়তা কমে যায় এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই সব মহামূল্য নোট তৈরী ও শ্রুতিলিখন করানো হয়। এতে পরীক্ষা পাসের সুবিধা হয় বটে তবে বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধিবিকাশের প্রভূত ক্ষতি হয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের স্বকীয়তার কোন স্থান নেই এবং ছাত্রদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভরভাবে পাঠ ও চিন্তার প্রয়োজনীয়তাবোধ নেই। রবীন্দ্রনাথ কলেজি শিক্ষার এই ধারাটির বিরোধী ছিলেন এবং এই জন্য শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের পাঠব্যবস্থা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। বিশেষ করে তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ করত। পাঠভবন ও বিদ্যাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি এই দোষ থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল।

তবুও সেই শিক্ষাভবনেই অন্যান্য বিদ্যালয়ের থেকে অনেকাংশে উন্নত ধরনের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে পড়াবার সময় মনে হ'ত যেন কোন কথা যান্ত্রিকভাবে শুধু ছাত্রদের পরীক্ষার পাসের সুবিধার জন্য না বলি, যেন কোথাও ফাঁকি না থাকে। সেই নির্মল পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যে আন্তরিক যোগ থাকে তার জন্য পড়ানোটা কেবল দায়সারা বক্তৃতাদান হতে বাধে। বিষয়বস্তুটা যতদূর সম্ভব আগে নিজের কাছে স্পষ্ট করে নিতে হয় এবং তারপর তাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে কিনা দেখতে হয়। কতগুলো গালভরা কথা ছুঁড়ে দিতে লজ্জা করে। সর্বদাই মনে থাকে যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুকাল ধরে স্কুলের ক্লাস নিতেন ও ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করতেন সযত্নে। এইরকম ভাবে প্রীতি ও সরলতার সঙ্গে পড়াবার রীতিই শান্তিনিকেতনে। এর থেকে কেবল ছাত্রছাত্রীরাই লাভবান হয় না, শিক্ষকেরাও হন। কারণ কোন মত বা তত্ত্বের অনেক জটিলতা ও দুর্বলতা শিক্ষকের বইপড়া গুরুগম্ভীর বাক্যরাশির আড়ালে

তাঁর নিজের কাছেও অপ্রকাশ থাকে। পাণ্ডিত্যের অহংকার দূরে রেখে যখন সহজ ভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায় তখন বিষয়টি নিজের কাছে পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার নতুন নতুন দিক নজরে পড়ে। পড়ানো ব্যাপারটি তাই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তৈরী বক্তৃতা দিয়ে ক্লাসকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার বর্বর প্রবৃত্তি শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় কেমন মনে আসে না। জৌলুস দিয়ে মেকীকে ঢাকতে ও চালাতে লজ্জাই হয়। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে হয় যে ছাত্রছাত্রীরা যে শিক্ষককে 'স্যার' বলে সম্বোধন না ক'রে 'অমলদা' 'সুধীরদা' এইভাবে সম্বোধন করে তার কিছুটা সম্পর্ক আছে এই ধরনের আন্তরিকতাপূর্ণ শিক্ষাদানের সঙ্গে। মিথ্যা আত্মাভিমান চলে যায় মন থেকে এবং নিজেদের ভাইবোনদের বঞ্চনা করতে মায়া হয়। দুইশত অচেনা শ্রোতাদের ভীড়ে এমন অনেক কথাই গম্ভীরভাবে বলে যাওয়া যায় যার ঠিক অর্থ সম্বন্ধে বক্তা বা শ্রোতা কারো বিশেষ স্পষ্ট ধারণা নেই। স্বল্পসংখ্যক আপনার জন নিয়ে পাঠব্যবস্থায় এই রকম রুচিবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটতে পারে না। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নৈকট্যভাব যে শিক্ষাক্ষেত্রে কত প্রয়োজন তা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অন্য কোন বড় শিক্ষায়তনের তুলনা করলেই বোঝা যায়।

বিদ্যাশিক্ষার এই আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা ছাড়া অন্য আর একটি বিষয়ের কথা মনে হয়। কেবল পাঠ্যতালিকা ধরে পরীক্ষা পাসের জন্য পড়াশুনা করা ও পঠিত বিষয়ে কিছুটা দক্ষতা লাভ জীবনের পরম লক্ষ্য নয় একথা শান্তিনিকেতনে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্বীকৃত ছিল। তাই নিজের নিজের মুখ্য পাঠ্যবিষয় ছাড়া প্রত্যেকে অন্য অনেক কিছু শিক্ষায় যোগ দিত। অভিনয় করা, সাহিত্য রচনা, ছবি আঁকা এ তো অনেকেই চর্চা করত। শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রীরা—যারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ধরে পড়াশুনা করত —আগে থেকে কোন তৈরী না করে যে কোন বনভোজনে বা আমোদ-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের কোন নৃত্যনাট্য—যেমন চিত্রাঙ্গদা বা 'চণ্ডালিকা'—অনায়াসে অভিনয় করতে পারত। যে রসবোধ, প্রাণের উচ্ছলতা ও তার সঙ্গে সংগঠনকৌশল ও সহযোগিতা গুণ এসবের পেছনে কাজ করে তার উৎপত্তিস্থল কোথায়? একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানে কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন নানাজনের সমাগম হয় তখন তাদের সম্মিলিত গুণ ও ক্ষমতা এদের সমষ্টির অনেক বেশী হয়। আর সেই আদর্শের অভাবে সেই মিলিত ফল সমষ্টির চেয়ে অনেক কম হয়, অর্থাৎ কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। তখন বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে একটি ঐকতানের পরিবর্তে হট্টগোলই হয়। আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে শক্তি ও সদ্‌গুণের অভাব নেই। এদের নিয়ে কত কী না করা যায়। দেশের এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় চাই সম্যক আদর্শ ও পথনির্দেশ। শিক্ষাব্রতীদের কেবল চাকরীলাভ ও পদোন্নতির কথা ভুলে গিয়ে, এবং পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটিকেই সব কিছু মনে না ক'রে, তরুণ-তরুণীদের মানুষ করার গুরু দায়িত্ব নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর শুভাগমন। শিক্ষকদের সঙ্গে এক বিকেলে তাঁর বিশেষ বৈঠক হল। আমাদের নানা প্রশ্নের তিনি উত্তর দিলেন ধীরতা ও সহানুভূতি সহকারে। অথচ দৃঢ় বিশ্বাস ভরা ছিল তাঁর প্রত্যেক কথা। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই কথা বললেন যে শান্তিনিকেতনে যাঁরা শিক্ষক হয়ে আসবেন তাঁদের বেতন কখনোই বাজারদর অনুযায়ী হবে না, কারণ এখানে যাঁরা আসবেন তাঁরা যদি ত্যাগের ভাব নিয়ে না আসেন তো সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে। এ কথার অর্থ খুবই গভীর। দেশের শিক্ষকদের যে সত্যকার দায়িত্ব তা যদি তাঁরা নিতে চান তাহলে তাঁদের ছাড়তে হবে অনেক আপাতলাভ। সেই লাভই হয় তাঁদের এই মহৎ কর্মের অন্তরায়। যথার্থ শিক্ষকতা করা একটা ব্রত, চাকরী নয়। শান্তিনিকেতনের যে সব জ্ঞানী গুণী শিক্ষাব্রতীদের নাম ওপরে করেছি তাঁদের বেতন অতি স্বল্প ছিল এবং তাঁদের সংসারনির্বাহ খুবই সাধারণভাবে চলত। এই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে শান্তিনিকেতনে থাকাকালে আর্থিক অভাব তেমন বোধ করিনি। কারণ চিত্তের প্রসাদলাভের ছিল সেখানে অনেক আয়োজন। উদার প্রকৃতির নিত্যনবীন রূপ ছিল একটি। তাছাড়া কিশোরদের সান্নিধ্য, তাদের খেলাধুলা হাসি গান শান্তিনিকেতনের আবহাওয়াকে সজীব করে রাখত। কবির গান মনে পড়ে—

"ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে রঙিন তব রাগে।"

এমনি কাজকর্মের মধ্যে যে আনন্দরস তাতেই মনপ্রাণ ভরপূর থাকত, তারপর প্রায় সন্ধ্যাতেই কোন না কোন নাটক, নৃত্য গান ও শিশুদের রচনার জলসা বসত লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে। চিত্তের দারিদ্র্যই প্রকৃত দারিদ্র্য ও উহা বেদনাদায়ক। তার নিবারণের উপায় সার্থক কর্তব্যকর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করা। সেই দারিদ্র্য যতদিন শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমান থাকবে ততদিন আর্থিক সুবিধা হলেও তাঁদের লক্ষণীয় কোন উন্নতি হবে না। অবশ্য অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে যেকথা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আদর্শের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে শিক্ষা ব্যাপারে যাঁরা লাভের দিকে নজর রাখবেন তাঁরাই আসল কাজে তেমন যত্ন নেবেন না এবং সেই সঙ্গে নিজেও সেই বিশেষ আনন্দ ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন যা সমাজসেবক সাধকেরই প্রাপ্য। বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে হয়তো শান্তিনিকেতনের এই আদর্শ কবিকল্পনা মাত্র এবং আজকের দিনে তা অচল। তবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেই পরীক্ষার ক্ষেত্রই আজকের শান্তিনিকেতন। মানবচরিত্র ও জগতের বাস্তবিক পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে শেষ পর্যন্ত কবির এই মূল আদর্শের কোন্ রূপটি কার্যক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করবে তা দেখবার বিষয়। তবে যে শান্তিনিকেতনকে জানলাম জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়টিতে তার মধ্যে যে আদর্শটি ফুটে উঠেছিল তার অপূর্ব আবেদন আছে মানুষের কল্পনায়।

আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লেখবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহস্রশীর্ষ প্রতিভার কোন বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনায় নামতে সংকোচ আসছে—শক্তির অভাব তো রয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে বলবার মতো কথা গুছিয়ে লেখা তো সম্ভব হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথকে একটু-আধটু কাছে দেখা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা সাজাবার চেষ্টা করছি।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তখন রবীন্দ্রপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যারা পাণ্ডা, তাদের মধ্যে একজন না হলেও পরিষদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশ ছিল। সেই সুবাদে ছোটখাট দল বেঁধে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কয়েকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একবার যখন জন চার-পাঁচ মাত্র ছিলাম, তখন কবি কিছুক্ষণ গল্প করার পর কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন—সেই গানের মধ্যে ছিল তখনকার সদ্যরচিত "একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।" পরে অনেকবার এ-গান শুনেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গলায় যা শুনেছিলাম, তা আজও ভুলতে পারি নি। অবশ্য পূর্বের তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বরে তখন মাধুর্য ও তেজের সমাবেশ কিঞ্চিৎ লঘু হয়ে পড়েছিল। যুবা রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা তো সে-অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমরা যা শুনেছিলাম, যা পেয়েছিলাম, তারও তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে লিখতে বসি নি; তবে গানের কথা এসে গেল সেই সব দিনের কথা ভেবে, যখন একেবারে কাছে থেকে দেখেছিলাম মহাপুরুষের সহজ, সরল মহানুভবতা। যাঁর সান্নিধ্যে বাক্‌স্ফূর্ত হবে না বলেই আমরা শঙ্কিত ছিলাম, সেখানে একান্ত সদাশয় একটি মানুষকে আমরা দেখলাম।

এই সদাশয়তারই সংবাদ পেয়েছিলাম এর কিছুকাল পূর্বে, আর তার উল্লেখ না করে পারছি না। আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন 'অটোগ্রাফ'-শিকারী। একখানি বাঁধানো খাতা সংগ্রহ করে তিনি স্থির করেছিলেন প্রথম পত্রেই নেবেন রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। রবীন্দ্রশিষ্য বলে খ্যাত তাঁর এক অধ্যাপক (প্রেসিডেন্সি কলেজের নয়) বারবার চেষ্টা করেছিলেন ছাত্রটিকে বিরত করতে, বুঝিয়েছিলেন যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সে কিছুতেই পাত্তা পাবে না। আমার বন্ধু কিন্তু ছাড়বার পাত্র ছিলেন না, তিনি ঠাকুরবাড়ি গেলেন, কবি খাতাটি রেখে দিয়ে বিকেলে আবার আসতে বললেন, এবং যথাসময়ে শুধু যে স্বহস্তে পুরো একপাতা একটি গান লিখে খাতাটি ফেরৎ দিলেন তা নয়, একেবারে অপরিচিত বালককে সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ পর্যন্ত করিয়ে দিলেন। যাঁর নামে অহঙ্কারী

অভিজাত বলে অপবাদ তখন অনেকে রটাত, তাঁর হাতে এই ব্যবহার বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল।

একেবারে খুব আবছা মনে আছে—আমাদের বাড়ির কাছেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে,—ভিড়ে দাঁড়িয়েছি যাঁরা আসছেন তাঁদের দেখার জন্যে। হঠাৎ শোনা গেল—"রবি ঠাকুর! রবি ঠাকুর!" আর লম্বা জোব্বা আর উঁচু টুপি-পরা এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন মণ্ডপে ঢুকলেন দেখলাম। বহু পরে দেখেছি সেই কংগ্রেসে ভাষণ-রত কবির প্রতিকৃতি, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা। কিন্তু কবিকে প্রথম দেখা সেই ভাবে। অথচ পিতৃবন্ধুদের আলাপ-আলোচনায় শুনতাম দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি নাম আর এমনও কথা যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা দেখেছেন একেবারে সাদাসিধে পোশাকে গল্পগুজব করতে। ঠিক যেন বিশ্বাস হ'ত না, কিন্তু বাস্তবিকই যখন তাঁকে দেখলাম তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের সারল্য ও দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আর রইল না।

আমার এক গুরুস্থানীয় বন্ধুর কাছে একবার বিদেশে যা শুনেছিলাম, তা না বলে পারছি না। সালটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু চীন থেকে ফেরার পর কবিগৃহে একটা মজলিস বসে। আমার বন্ধু তখন সদ্য বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছেন, বিদগ্ধমহলে তাই একটু জায়গা পেতে মুশকিল হয় নি। আর এক সহকর্মীর সঙ্গে তিনিও জোড়াসাঁকোয় হাজির হয়েছিলেন। তাঁরই কাছে শোনা যে গুরুবন্দনায় ব্যস্ত শিষ্যেরা হয় কথা বলছিলেন না, নয় শুধু শুনতে চাইছিলেন কেবল গানের পর গান যা তখন কবির মনে এসে জড়ো হচ্ছিল। সেই শিষ্যদের সচকিত করে আমার বন্ধু যখন প্রায় মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, আপনি তো ঘুরে এলেন, চীনেরা নাকি ইঁদুর আর আরসোলা খায়, আপনি কিছু দেখলেন?" তখন শিষ্যবৃন্দ ক্রোধে হতবাক্ হলেও তিনি হেসে উঠে চীনাদের খাদ্য সম্বন্ধে অতি প্রসন্ন ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন; আধ্যাত্মিক আলোচনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন।

আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এ-বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি তখন তাঁকে আগলে রাখার লোকের অকারণ ভিড় একটু বেশিই ছিল। তিনি যখন "হিবর্ট লেক্‌চার্স" দিতে অক্সফর্ডে গেছেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। দেখেছি, বাইবেলের যুগের ঋষির আকৃতি নিয়ে সবাইকে তিনি অভিভূত করছেন, কিন্তু ভিতরকার মানুষটিকে তিনি চেপে রাখতে পারছেন না, চাইছেন না—কিন্তু ভক্তের দল তাঁকে ঘিরে গণ্ডী নির্মাণ করল, তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন, নিজের মধ্যে আশ্রয় না নিয়ে পারলেন না। ভক্তবৃন্দ যখন অনুপস্থিত, তখন তাঁর অন্য মূর্তি—সেই সহজ, সরস মূর্তি দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য তো কম নয়!

১৯৩০ সালে, সোভিয়েট যাত্রার প্রাক্কালে, কবি যখন অক্সফর্ডে ছিলেন, তখন ভারতীয়

ছাত্রদের 'মজলিস' তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। মহাত্মা গান্ধী তখন এদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছেন, 'ডাণ্ডি'-অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতিও চলেছে। মজলিসের তখনকার সভাপতি, উত্তরপ্রদেশের একজন মুসলমান ছাত্র, কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—"তোমাকে পেয়ে আমরা কত সুখী, কিন্তু তুমি আজ এখানে কেন? কেন আজ গান্ধীজীর পাশে তোমাকে দেখছি না? আমাদের মন যে বড় বেশি ভারাক্রান্ত। আমাদের প্রশ্নের ধৃষ্টতা মার্জনা কোরো।" তারুণ্যের এই অসৌজন্যকে কবি কিন্তু ভুল বুঝলেন না। ধীর স্থির ভাষায় উত্তর দিলেন—"আমার অস্ত্র হল ভিন্ন, কিন্তু দেখো, দেশের মুক্তির কাজে আমার বীণার শক্তি কম নয়।" আর আমাদের কাছ থেকে একখণ্ড 'চয়নিকা' চেয়ে নিয়ে পড়লেন "দুঃসময়" কবিতাটি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

প্রতিভার সেই উদাত্ত বিক্ষোভ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়; আবৃত্তি যে কত অর্থঘন হতে পারে, তা যেন পূর্বে জানা ছিল না। কবির সেই দৃপ্ত দেশাভিমানী মূর্তি যারা দেখেছে, তারা কখনও ভুলবে না।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাধনার এমন এক স্তরে বিচরণের অধিকার পেয়েছিলেন, তাতে কস্তুরী মৃগের মতো নিজেরই সৌরভে মুগ্ধ হয়ে থাকলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলত না। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুনিয়ার খবর তিনি রাখতেন, আর খ্যাত-অখ্যাত বাঙালী লেখকদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখতেন, তাদের উৎসাহ দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। ১৯৩৭ সালে স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় "প্রগতি" অভিহিত সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করার সময় তাঁর মনের এই অপরিমেয় ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখকসংঘের পক্ষ থেকে এক ইস্তাহার লিখে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষীদের স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রস্তাব হয়েছিল। ফ্যাশিস্ট বর্বরতাকে ধিক্কৃত করাই ছিল ইস্তাহারে মূল কথা। মুসাবিদা নিয়ে আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত অন্তত একজন খুব জোর করে বললেন, "সুরটা নরম করে দাও একটু, নইলে

কবি অপ্রসন্ন হবেন।" একান্ত অনিচ্ছায় কয়েকটা অদলবদল করা হল, কিন্তু কবির কাছে যাওয়ার পর তিনি যেভাবে কথা বললেন তাতে বেশ বোঝা গেল পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের ধারণা একেবারে ভুল। যাঁরা মহৎ ব্যক্তি, তাঁদের ওপর ইতরজনের চাপ অতিরিক্ত যাতে না পড়ে, সেজন্য কিছু দেহরক্ষী-জাতীয় লোকের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আগলে রাখার চেষ্টা করতেন, তাঁরা হয়তো দেশের কিছু অপকারই করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে তা সত্ত্বেও আমরা রবীন্দ্রনাথের চরাচরব্যাপ্ত মূর্তি দেখেছি, তাঁর অখণ্ডমণ্ডলাকার প্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি। আমরা ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

চির-চিহ্ন

নির্মলকান্তি মজুমদার

রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে অনেকবার দেখেছি। কাছ থেকে দেখবার সুযোগও কয়েকবার হয়েছে। ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে দেখেছি কবিতা আবৃত্তি করতে, প্রেসিডেন্সি কলেজ ফিজিক্স থিয়েটারে দেখেছি বক্তৃতা করতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সেনেট হলে দেখেছি স্যার আশুতোষের শোকসভায় সভাপতিরূপে। সেসব দিনের কথা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির ছায়াবনে। কিন্তু যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম বোলপুর বাঁধগড়া হাই স্কুলে, সেদিনের কথা কোনদিনই ভুলতে পারব না। তাঁর ঋষিকল্প মূর্তি ভাস্বর দীপ্তিতে চির-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল আমার মনের পাতায়।

বহুদিন আগেকার ঘটনা। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। সংবাদ আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। না জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে, না জানি নোবেল প্রাইজ কি। স্কুলের শিক্ষক বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁর কাছে অনেক খবর পাই—নোবেলের জীবনবৃত্তান্ত, নোবেল প্রাইজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, 'গীতাঞ্জলি'র স্বীকৃতি ও সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ, বাঙালীর বিশ্বজয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতা অবসরমতো আমাদের পড়িয়ে শোনান ও বুঝিয়ে দেন। তার মধ্যে 'দেবতার বিদায়', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'সোনার তরী' উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভায় বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ

করতেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর-পরিবারের সন্তান—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। মহর্ষি বীরভূম জেলার বোলপুরে পবিত্র পল্লীপরিবেশে 'শান্তিনিকেতন' নামে আশ্রম রচনা করেছিলেন। কবি সেখানে স্থাপনা করেছেন আদর্শ বিদ্যালয়।

ছেলেবেলায় এইটুকু ছিল আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। বরদাবাবু নিজে কবি—কাব্যজগতের ঢেউ এসে লাগত তাঁর বিজন উপকূলেও। তাঁর সান্নিধ্যে না এলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে যেতাম। ইদানীং আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের জন্য রাশি রাশি জীবনকাহিনী ছাপা হচ্ছে। সে সময়ে জীবনী সাহিত্য গ'ড়ে ওঠেনি। দু-চারখানি যা ছাপা হ'ত তা গ্রামে ছিল একান্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন প্রতীচ্যের মনীষী মহলে। তাঁর জন্য গর্ববোধ ও তাঁকে জানবার জন্য আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পল্লীর নামহারা নির্জনে সে সুযোগ কোথায়?

বড়দা তখন মুনসেফ। ১৯১৫ সালে বদলি হয়ে এলেন বোলপুরে। আমি উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা পাস করেছি। বোলপুরে হাই স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করলেন বড়দা। একটা নতুন আশার বীথিকা বিস্তৃত হ'ল আমার সীমিত দিগন্ত পেরিয়ে। বাঁধগড়া হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম গরমের ছুটির আগেই। বাঁধগড়া হাই স্কুলের বর্তমান নাম বোলপুর হাই স্কুল। স্কুলটি ছিল শহর থেকে দূরে—সুরুলের পথে। সুরুলের রাস্তার ডান দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। স্কুলবাড়ির তিনটি ব্লক—সামনের ও বাঁ ধারের ব্লক পুরনো, ডান ধারের ব্লক নতুন ও অপেক্ষাকৃত উঁচু। বাঁ ধারের ব্লকের পিছনে শালবন। ঐ বনের মধ্যে দিয়ে ভুবনডাঙার মাঠে প'ড়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়া যেত। পায়ে চলার পথটি মোটেই নিরাপদ নয়। সাপের উপদ্রব খুব। বনের ভিতর বেশী দূর যাওয়া স্কুল কর্তৃপক্ষের নিষেধ। তবুও গরমের দিনে টিফিনের সময় কাছাকাছি শালবনের ছায়ায় ছেলেরা খেলাধুলো গল্পগুজব করত।

কোর্টের কাছে গভর্মেণ্ট কোয়ার্টার্স। সেখান থেকে দু মাইল দূর বাঁধগড়া স্কুল। রোজ পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া হাই স্কুলের নতুন আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কিছু সময় লাগে। অন্যদিকে মাথা ঘামাতে পারিনি। ক্রমে মন উৎসুক হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন দেখবার জন্য। একদিন আমাদের মাস্টারমশাই রাধাকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে আসি। চমৎকার লাগে তৃণ-রোমাঞ্চিত ভূমিপ্রকৃতি, উদার আকাশ, উন্মুক্ত মাঠ, ফুলে ভরা উপবন, গন্ধে আকুল বাতাস, সবুজের সমারোহ, আশ্রমের মহিমা। কত জিনিস দেখি—বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, উপাসনা মন্দির, রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ, মহর্ষির সাধনার স্থান প্রসিদ্ধ ছাতিমতলা—যেখানে শ্বেত মর্মরবেদিতে লেখা আছে—'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। রবীন্দ্রনাথকে দেখার সৌভাগ্য হয় না। বিষণ্ণ মনে ফিরে আসি।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের স্কুলের দুটি ফুটবল ম্যাচ হয়—প্রথমটি

আমাদের মাঠে, দ্বিতীয়টি শান্তিনিকেতনের মাঠে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে যাই। উদ্দেশ্য খেলা দেখা নয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখা। খেলার মাঠে লাইনের ধারে ধারে অনেকগুলো বেতের চেয়ার ও মোড়া সাজানো। দেখে উল্লসিত হই। নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ের কর্ণধারেরা মাঠে আসবেন ছেলেদের উৎসাহ দিতে। বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট দর্শক উপস্থিত হন—পাঞ্জাবি গায়ে পিয়ার্সন সাহেব, আলখাল্লা-পরা রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ্' হাসিমুখে জগদানন্দ রায়। কিন্তু যাঁকে দেখতে আসা তিনি কই? মনে হয় সকলকে দেখছি অথচ কাউকে দেখছিনে। কবির শরীরটা তেমন ভালো নেই—তিনি মাঠে আসতে পারবেন না—এই রকম একটা বার্তা ভেসে আসে কলরবের মধ্যে। আবার আশাভঙ্গ। ম্লানমুখে ঘরে ফিরি যদিও আমাদের স্কুল তিন গোলে জয়ী হয় সেদিনকার প্রতিযোগিতায়।

পুজোর ছুটিতে মার কাছে কৃষ্ণনগরে আসি। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই দুটি প্রশ্ন করে—শান্তিনিকেতন দেখেছ? রবীন্দ্রনাথকে দেখেছ? প্রথমটির উত্তরে মুখর হয়ে উঠি, দ্বিতীয়টির বেলায় একেবারে নীরব। লজ্জায় মাথা হেঁট—লোকের কাছে মান থাকে না। পাঁচ মাস বোলপুরে রয়েছি অথচ কবিদর্শন হয়নি। দুর্ভাগ্য বই কি। চাওয়া ও পাওয়ার মিলন কি সহজে ঘটে? ধৈর্য ধরে থাকতে হয়।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। ১৯১৬ সালে জানুয়ারি মাসে কয়েকজন আত্মীয় আসেন বোলপুরে। তাঁদের গাইড্ হয়ে শান্তিনিকেতনে যেতে হয় কিন্তু ফিরে আসি অন্তরে অশান্তি নিয়ে। যত দিন যায় তত হতাশ হয়ে পড়ি। ভাবি হঠাৎ কোন্ দিন ছাড়তে হবে বোলপুর, অপূর্ণ রয়ে যাবে অভিলাষ।

চৈত্র মাস—মার্চের শেষ কি এপ্রিলের প্রথম। হেডমাস্টারমশাই বিজ্ঞপ্তি দেন:—আমাদের পুরস্কার বিতরণ উৎসব—সভাপতি রবীন্দ্রনাথ—বিশেষ অতিথি রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ্। একান্ত অপ্রত্যাশিত সংবাদ। আনন্দে মন নেচে ওঠে।

প্রবল উত্তেজনায় সপ্তাহ কাটে। অবশেষে উপস্থিত হয় সেই বহু-প্রতীক্ষিত দিন। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। আঁধারের বুকে আলোর আশ্বাস জাগিয়ে বিদায় নিয়েছে শুকতারা। পাখিরা কেউ জেগেছে, কেউ জাগেনি। অন্তরে অধীর আগ্রহ কবিদর্শনের। শুভলগ্ন সমাগত। আবার ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করে—রবীন্দ্রনাথের কাছে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে পারব কি? বিছানায় শুয়ে কল্পিত কণ্ঠে রিহার্স্যাল দিয়ে নিই—'সুমহান বিশ্বযন্ত্রে উঠিছে ঝংকার যার, যার প্রেমে মাতোয়ারা চন্দ্র সূর্য পারাবার।'

বেলা সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠান। ছাত্রদের হাজির হতে হবে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ি।

শিক্ষকরা আগেই এসে গিয়েছেন। নতুন ব্লকের হল ঘরটি সাজানো হয়েছে ফুলের মালায় লতায় পাতায়। তিন দিকের দেয়ালে টাঙানো হয়েছে ছেলেদের আঁকা বাছাই করা ছবি। সভার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। সভাপতি ও মাননীয় অতিথির চেয়ারের সামনে

টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, ধূপদানিতে ধূপ। বঙ্কিমবাবু (হেডমাস্টার মশাই) স্কুলের মাঠে রাস্তার ধারে দেবদারু তোরণের দুপাশে সার বেঁধে দাঁড় করালেন আমাদের। সভাপতি ও মাননীয় অতিথিকে করজোড়ে অভিবাদন জানাতে হবে। বাইরে বসন্তের শিহরণ, অন্তরে অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দীপনা। অবর্ণনীয় অবস্থাই বটে।

সাড়ে আটটার কিছু আগে গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ায়। বোলপুরে ঐ গাড়িকে 'শান্তি-নিকেতনের গাড়ি' বলা হ'ত। গাড়ি থেকে নামেন জ্যোতির্ময় পুরুষ—পরনে সাদা ঢিলে পাজামা, গায়ে ঢিলে হাতা সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। সে এক আশ্চর্য আবির্ভাব, অনির্বচনীয় অভ্যুদয়! যেমন রূপ তেমনি কণ্ঠ। চকিতে চমকিত হয়ে যাই। স্বর্গে আছি কি মর্তে আছি বুঝতে পারিনে।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হয়। ফোর্থ মাস্টারমশাই উদ্বোধন সংগীত গান—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। রবীন্দ্রনাথ হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে আসেন। আবৃত্তি সুরু হয়। 'The Light of Asia' থেকে আবৃত্তি করে ফার্স্ট ক্লাসের একজন ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার প্রতি' করে থার্ড ক্লাসের একটি ছেলে। আমি করি যোগীন বসুর একটি ছোট কবিতা কোনরকমে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। সে প্রায় অগ্নিপরীক্ষা। এবার গানের পালা—রজনী সেন, ডি. এল. রায় ও রবীন্দ্রনাথের। তারপর বঙ্কিমবাবু বলেন—সভাপতিমশাই অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত—জাপান হয়ে আমেরিকা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আয়োজন অনেক বাকী। তিনি কাল তোমাদের ছুটি দিয়েছেন, আজ তোমাদের কাছে ছুটি চাইছেন। ছবি আঁকায়, কবিতা আবৃত্তিতে ও গানে তোমরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ তাতে তিনি ভারি খুশী হয়েছেন। বার্ষিক বিবরণী পাঠ ও পুরস্কার বিতরণ পরে হবে। এখন সভাপতিমশাই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা করেন। তাঁর সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি গলায় আমরা মুগ্ধ। তাঁর বাণী উপলব্ধি করার অবকাশ কোথায়? বক্তৃতার বিষয়বস্তু সঠিক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে তিনি ছবি, গান ও কবিতার সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলেছিলেন। আর আমাদের বলেছিলেন বেশ ভালো ক'রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে। উপদেশটি তখন আমাদের সত্যিই অদ্ভুত লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থে উক্ত বিষয় দুটির অপূর্ব বিশ্লেষণ আছে। 'জাপানে-পারস্যে' পড়বার সময় মনে হয়েছে এ ভাব-ধারার ইঙ্গিত যেন ছেলেবেলায় তাঁর মুখ থেকে পেয়েছি। তাই 'জাপানে-পারস্যে' থেকে বিশেষ অংশ দুটি উদ্ধৃত করছি:

> ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান।

রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

* *

জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গ মর্তে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোম্‌টা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়।

সভাপতির ভাষণের পর পনের মিনিটের বিরতি। আমরা সকলে সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। বিদায়বেলায় হাত তুলে তিনি আমাদের আশীর্বাদ জানান।

যে-সব মহাপুরুষ অনবদ্যসৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের কৃষ্টির ইতিবৃত্তে রচনা করেছেন শাশ্বত অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। জীবনের মেঘে রৌদ্রে, দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে মানুষ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে কত না শান্তি, কত না আনন্দ, কত না অনুপ্রেরণা! তাই আজ জগৎ জুড়ে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অনুষ্ঠানের পর্ব চলেছে। কোথাও নির্মিত হচ্ছে মর্মর মূর্তি, কোথাও স্মৃতি-সদন, কোথাও নাট্যমন্দির। জীবনচরিত ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ফিল্ম ও মডেলের মধ্য দিয়ে। আবৃত্তি, গান, অভিনয়, আলোচনা, সুধী সম্মেলন, গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনীর অন্ত নেই।

আমি কবিগুরুকে স্মরণ করতে চাই নে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতির ভিতর দিয়ে। আমি তাঁকে স্মরণ করছি আমার প্রথম-দেখা দিনের অপ্রতিম পরিবেশে—জনতার মুখর মেলার বাইরে—বাঁধগড়া স্কুলের প্রশান্ত প্রাঙ্গণে। চৈত্রের সেই ঝিরঝিরে হাওয়ায়, শালবনের সেই স্নিগ্ধ ছায়ায়, ঝরাপাতার সেই মর্মরধ্বনিতে। স্মরণ করছি অপরাজেয় জীবনশিল্পীকে প্রকৃতির অবারিত শিল্পশালায়।

যখন রবো না আমি মর্ত্য কায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

* *

সে-আমারে কে চিনেছে মর্ত্য কায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন ॥

রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ স্বগত চিন্তা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতিভার পরিচয় কি অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, না, উত্তরপুরুষের কর্মসাধনায় গভীর প্রভাব মুদ্রণে ?

এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যদি আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিচার করি, তবে আমাদের সযত্ন-লালিত ধারণা বিপর্যস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনের জাতীয় নায়ক রূপে বিবেচিত হবেন, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চিন্তায় রুচিতে কর্মে বাচনে লেখায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়েছে, এ-কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। কবিতায় গানে নৃত্যে সমাজজীবনে রবীন্দ্রনাথ নামক বিশাল মহৎ ব্যক্তিত্বের সদা-উপস্থিতি আমরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করি।

কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে, রবীন্দ্র-নাটক ও রবীন্দ্র-উপন্যাস বাংলা নাটক ও উপন্যাসের মূল ধারার যতটা অনুসারী তদপেক্ষা বেশি বিদ্রোহী। রবীন্দ্র-নাটকের প্রথম পর্বের সঙ্গে বাংলা নাট্যধারার যে মিল রয়েছে, তা পরবর্তী রবীন্দ্র-নাটকে পাওয়া যায় না। যে-সব ঋতুনাট্য ও রূপক-প্রতীক নাটকের উপর রবীন্দ্র-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, অদ্যাবধি তার যোগ্য অনুসরণ হলো না। 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' বা 'ফাল্গুনী'র মতো বাংলা নাটক রচিত হয় নি। বরং রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কম শক্তিমান নাট্যকারের প্রভাব অনেক বেশি। রবীন্দ্র-উপন্যাস সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের যে নাড়ির যোগ আছে, তা পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাওয়া যায় না। 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস বঙ্কিম-উপন্যাসের ধারায় রচিত। রোমান্স ও ইতিহাসরসের উপস্থিতি এই তিন উপন্যাসকে বাংলা উপন্যাসের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে। তথাপি এখানেই

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ইতিহাস ও রোমান্স-রসকে ছাপিয়ে উঠেছে লেখকের গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতিরস। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে লেখকের বিশিষ্ট আদর্শ বা ধারণা প্রাধান্য লাভ করেছে। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের ভিত্তি রোমান্স। এতে হয়ত ঘটনাবিন্যাসে বঙ্কিম-অনুস্মৃতি আছে, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ ছেড়ে বাস্তবতার পথে ঝুঁকেছেন। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যে ইতিহাস ও রোমান্সের পথ ত্যাগ না করলে বাংলা উপন্যাসের গতি রুদ্ধ হবে। তথাপি মোটামুটি এই তিন উপন্যাসেই বঙ্কিমানুসারিতা লক্ষ্য করা যায়।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন 'চোখের বালি' উপন্যাসে। প্রকাশকালবিচারে দেখা যায় 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত হয়েছে 'চোখের বালি'র পরে। রবি-প্রতিভা এখানে পিছু হটেছে। মনে হয় 'চোখের বালি'র খসড়া তিনি 'নৌকাডুবি'র পরেই করেছিলেন। তা ছাড়া এই পশ্চাৎগতির কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।

'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসে যুগ-প্রবর্তক উপন্যাস। অধুনা উপন্যাসে 'বাস্তবতা' বললে আমরা যা বুঝি, তার নিশ্চিত সূচনা এখানেই হলো। বঙ্কিমের নৈতিক বিচার ও কাব্যবোধ ছেড়ে তথ্যানুসন্ধান, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও বাস্তব ঘটনানুগত্য এখানেই প্রথম দেখা গেলো। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসকারবৃন্দ বিশেষত শরৎচন্দ্র বারবার 'চোখের বালি'র ঋণ স্বীকার করেছেন। সমাজ-ভৎর্সিত প্রেমের সহানুভূতিসূচক বিশ্লেষণ এই প্রথম হলো। বাংলা উপন্যাসে বিধবা-নায়িকার জয়যাত্রার সূচনা 'চোখের বালি'তেই হয়েছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রকরণ, কৌশল ও রীতি এখান থেকেই পরবর্তী উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। সমাজ-অনুমোদিত প্রেমের ক্রমপরিণতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সূচনা এখানেই হলো। কিন্তু 'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের শেষ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের সাধারণ পথ ছেড়ে এক অ-সাধারণ পথে যাত্রা করেছে।

'চোখের বালি'র পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা'। এটি বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি। 'গোরা' উপন্যাসের বিশাল পটভূমি, মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতি ও মহৎ আদর্শের রূপায়ণ বাংলা উপন্যাসে দ্বিতীয়রহিত। এই উপন্যাস বাংলাদেশের একটা যুগসন্ধির ফ্রেমে আবদ্ধ হয়েও তার মধ্যে বদ্ধ থাকে নি। ধর্মবিপ্লব, দেশাত্মবোধ, ভারত-চেতনা ও উদার মানবতাবোধ এই উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে। আর কোনো বাঙালি নায়ক গোরার মতো উপলব্ধি করে নি যে, 'মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ'। আমাদের সংকীর্ণ বদ্ধ জীবনে 'গোরা' বিশাল জীবন-মহাসমুদ্রের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হয় 'গোরা' অনন্যসাধারণ উপন্যাস এবং সেই সঙ্গেই একথা স্বীকার্য, এই ধরনের উপন্যাস বাংলায় আর লেখা হয় নি।

'গোরা'-পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসনিচয় আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না। 'গোরা'র আদর্শলোকবিহারী ছায়াপথ হয়ত সেগুলিতে প্রসারিত হয় নি, কিন্তু অনন্য-সাধারণ কাব্যপরিবেশের ফলে তা আমাদের কাছে অনায়ত্ত। মহৎ কবিকল্পনার সঙ্গে এই উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে সাংকেতিকতা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং তীব্র তীক্ষ্ণ জীবনজিজ্ঞাসা।

'চতুরঙ্গ' 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা বাঙালি বটে, বাংলা ভাষাতেই তারা মনের ভাব আদান-প্রদান করে, তথাপি একথা অনস্বীকার্য তারা কবি রবীন্দ্রনাথের মানসসন্তান, সমাজনিরপেক্ষ অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নীলকুঠিগুহা, তপ্তবালুকাস্তীর্ণ নদীগর্ভ, শিলংয়ের পার্বত্যপথ, ঊর্মিমুখর মোটরপথ, অজস্র পুষ্পশোভিত উদ্যান আমাদের পরিচিত সংসারের বাইরে বলেই মনে হয়। দামিনী, লাবণ্য, ঊর্মি, নীরজা—এরা কি বাঙালি নায়িকা, না, মহৎ কবির অনন্যসাধারণ সৃষ্টি—এই অপ্রতিরোধ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আমাদের মন শেষোক্ত উত্তরের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। ঘটনাবিরলতা, সূক্ষ্মকাব্যময় পরিবেশপ্রাধান্য, তীব্র তীক্ষ্ণ তির্যক সংলাপ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা—সব মিলিয়ে এক স্বতন্ত্র জগৎ। এই জগতে সাধারণ বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই, সে কেবল দূরে দাঁড়িয়ে কবি-সৃষ্ট জগতের মানব-মানবীর জীবনলীলা দেখে ও উপন্যাসপাঠে অতৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফেরে, আর এই অতৃপ্তি অসামর্থ্যজনিত, এ-সত্যও গোপন থাকে না।

একটি উদাহরণই যথেষ্ট। 'চতুরঙ্গে'র নায়িকা দামিনী আশ্চর্য রমণী, সে আমাদের অভিজ্ঞতালোকের অধিবাসিনী নয়। তার মনোবেদনা ও আকাঙ্ক্ষাকে কবি-ঔপন্যাসিক উপস্থিত করেছেন যে তপ্তবালুকাস্তীর্ণ নদীগর্ভের পটভূমিতে তা-ও আশ্চর্য—"যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।"

আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় এমন উপন্যাস 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' এবং 'যোগাযোগ'।

'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। প্রথমটির পটভূমি স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয়টির সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন। কিন্তু এ দুটিকে কোনোমতেই 'রাজনৈতিক উপন্যাস' বলা যায় না। বস্তুতঃ কবি-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ অর্থে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' লিখতে রাজি ছিলেন না। সেইজন্যেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' বা দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু' প্রভৃতি রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে এ দুটির নাম উচ্চারণ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উপন্যাস আসলে তাঁর ভাবের বাহন। মতবাদ-প্রাধান্যের অভিযোগ এই দুটি উপন্যাস সম্পর্কে করা যায়। নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা, অতীন, এলা—এরা যতটা বাস্তব-চরিত্র তদপেক্ষা বেশি 'আইডিয়া'র বাহন—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ

অস্বীকার করা যায় না। দুটিতেই কবির ভাবানুগত্য ও কাব্যমনোভাব আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে। মনে হয় এদের সমস্যা ঠিক বাস্তব সমস্যা নয়, মনোলোকের এক অপরিচিত সংকটসংকুল পথে এদের যাত্রা। এই যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ তাদের নিয়ামক। সাধারণ পাঠকের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। চরিত্র-পরিকল্পনা ও জীবনাদর্শের অতিশয়-স্বাতন্ত্র্য এদের সমাজ-ও-পরিবার-নিরপেক্ষ করে তুলেছে, ফলে এদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে নি। বর্ণনাভঙ্গী ও সংলাপের স্বাতন্ত্র্যও এদের সরিয়ে নিয়ে গেছে প্রাত্যহিক জীবন থেকে। এবং সে-কারণেই বাংলা উপন্যাসে এদের উত্তরপথিককে পাই না।

বাকি রইল 'যোগাযোগ'। এই একটি উপন্যাস যেখানে আধুনিক উপন্যাসপাঠকের প্রত্যাশা সর্বাধিক, শোচনাও সর্বাধিক। কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বা ভাব-গভীরতার প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখেও একথা স্বীকার্য যে, এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজমের দিকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। মধুসূদন-কুমুদিনীর জীবনে যে সংঘর্ষ তা কেবল আদর্শগত নয়, জীবনের গভীরে তার ভিত্তি। দুঃখের বিষয় ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন না, সন্তান-সম্ভবা কুমুদিনীর সুলভ পরাজয়স্বীকারের মধ্যে উপন্যাসের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটল। 'যোগাযোগ' একটি বৃহৎ উপন্যাসের খণ্ডরূপ মাত্র। এই খণ্ডরূপের উৎকর্ষের জন্যই অলিখিত পূর্ণরূপের অপ্রাপ্তিজনিত আপসোস অপ্রতিরোধ্য। এখানে ঔপন্যাসিক কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতিতে উপনীত হতে দ্বিধাবোধ করেছেন। শুধু তাই নয়, নায়িকাকে যতটা শ্রেণী-প্রতিনিধিরূপে দেখিয়েছেন ততটা বাস্তবতাসম্মত করে তোলেন নি। কুমুদিনীর আন্তর-সৌন্দর্যের বিভা তাকে বাইরে এক কাব্যসুষমা দান করেছে, ফলে কুমুদিনী আর বাস্তবলোকের নায়িকা থাকে নি, কল্পলোকে উপনীত হয়েছে। অথচ এই উপন্যাসের আদি পরিকল্পনায় যে সুপ্রচুর সম্ভাবনা ছিল, তা ফলবতী হলে একটি অসাধারণ উপন্যাসের জন্ম হতো।

কবিত্বের সুরভি, ধ্যানের চারুতা আদর্শের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য রবীন্দ্র-উপন্যাসকে এক অনন্যসাধারণ গৌরব দান করেছে, এবং সে-কারণেই তা বাংলা উপন্যাসের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্র গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রভাব বাংলা উপন্যাসে যতটা স্পষ্ট, রবীন্দ্র-প্রভাব ততটাই দুর্লক্ষ্য। রবীন্দ্র-উপন্যাস বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের সম্পদ, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহার হয় নি। এই অকৃতার্থতার বেদনা আমাদের বহন করে চলতে হচ্ছে। মনে হয় রবীন্দ্র-উপন্যাস এমন এক সুদূর জ্যোতির্মণ্ডলে অবস্থিত, যার আলোক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এখনো এসে পৌছয় নি।

রবীন্দ্র-নাটক পাঠের ভূমিকা

ভোলানাথ ঘোষ

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচার করতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীকে আধুনিক যুগ আখ্যা দেওয়া হয়। এই একটি শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি নানা সাহিত্য-শাখা একসঙ্গেই বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মবোধ, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে শুভ পরিবর্তন সূচিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমাদের সামনে পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আমাদের মানসিক পরিবর্তনের জন্যে তাদের যে উৎকণ্ঠা তা সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনের স্বার্থেই দেখা দিয়েছিল। আমাদের মানুষ করার উদার (!) সংকল্প গ্রহণ ক'রে, ঘুণে-ধরা ঐতিহ্য (!) থেকে মুক্তি দেবার প্রেরণায় আমাদের সামনে পাশ্চাত্ত্যের বিরাট ঐশ্বর্যসম্পদ তুলে ধরেছিল। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য পশ্চিম ভূখণ্ডের বিস্ময়কর শক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দেয়। পাশ্চাত্ত্যের সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজীবনের সুর ধ্বনিত হয়েছিল তার ইতিহাস আমাদের বিস্মিত করে, উৎসাহিত করে। এই নবজীবনের—নব জাগরণের সুর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও ধ্বনিত হ'লো। সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষা প্রভৃতিতে নবচেতনার জোয়ার জেগে ওঠে—নতুন জিজ্ঞাসা বাঙালীকে নতুন পথে চলার প্রেরণা জোগায়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে বাংলা দেশেও যে 'নতুন করে গড়ে তোলা'র শুভ ইচ্ছা দেখা দেয় বাংলা নাটক সেই ইচ্ছারই সার্থক প্রকাশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নাটক রচনা শুরু হয়। প্রথম পর্বের নাটককে আমরা প্রস্তুতির যুগের রচনা বলতে পারি। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' থেকে কবি শ্রীমধুসূদনের নাট্যরচনা পর্যন্ত নাট্যধারাকে এই পর্বভুক্ত করা যায়। অনেকে দীনবন্ধু মিত্রকেও এই পর্বভুক্ত করেন—কিন্তু আমরা তাঁকে দ্বিতীয় পর্বের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করছি। এই দ্বিতীয় পর্বে রয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। এই পর্বকে নাট্যকার-পর্ব বলা যায়। নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সূচনা এই সময় থেকে। তার পর থেকে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। নাটক রচনার এই দ্রুত প্রসারের কারণ—রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পর্বে নাটকাভিনয়ই মুখ্য। বর্তমান দিনে নাটক রচনার চেয়ে নাটক-অভিনয়ের বাহুল্য লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী-জীবনে যে অভাবনীয় রূপান্তর সূচিত হয়—যে রসতৃষ্ণা জাগে, বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নাট্যরচনার দ্রুত প্রসার সেই প্রেরণারই শুভ ফল। নাট্যকার ও নট

গিরিশচন্দ্রের শুভ আবির্ভাবও বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আরও সার্থক করে তোলে।

মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, বেদনা, ব্যর্থতা ও সার্থকতার কাহিনী অবলম্বনে সার্থক নাটক গড়ে ওঠে। মানবমনের গহনে যে সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি প্রবৃত্তি রয়েছে সেখানেও নাট্যকারকে প্রবেশ করতে হবে। তাঁকে প্রয়াসী হ'তে হবে—

> To travel near the Tribes
> And fellowships of men, and see ill sights
> Of madding passions mutually inflamed ;
> Must hear humanity in fields and groves
> Pipe solitary anguish.

এই প্রয়াস না থাকলে কোনো রচনাই সার্থক হ'তে পারে না। নাটক ও উপন্যাস রচনায় অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও অনেকখানি রয়েছে। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য 'to interpret life by representation' হলেও দু'জনের শিল্পরীতি এক নয়। উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের যতখানি স্বাধীনতা থাকে নাট্যকারের ততখানি থাকে না। নাট্যকারকে নাটকের পাত্রপাত্রী, অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকদের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। কাহিনীর গতিবেগ মন্থর হলে চলবে না। কারণ 'The Drama is action, action, action, Sir, not confounded philosophy.' এই action বা ঘটনার ধারা—নাটকের চরিত্রগুলির নানারকম ভাববৈচিত্র্য বাইরের ঘটনা-পরম্পরায় যে ভাবে চালিত হয়—তারই মধ্যে প্রকাশ পায়। নাটকে নাট্যকার ছাড়া আর সবাই কথা বলেন—উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বেশি কথা বলেন। নাটক কঠোর নিয়মনিগড়ে বাঁধা। সে দেখাতে চায় জীবন্ত মানুষকে আর উপন্যাস মানবজীবনের ভাষ্য করতে গিয়ে তাকে জীবন্ত করে দেখাবার চেষ্টা করে। কোনো বিদেশী সমালোচকের মতে 'The drama is the most vigorous form of literary art ; prose fiction is the loosest.' নাটক' যেমন 'Copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth'—তেমনই তা দর্শক বা শ্রোতা এবং অভিনয় ও অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চ-সাপেক্ষও বটে। এর কোনো একটি বাদ দিয়ে নাটক সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তবে এমনও নাটক আছে অভিনয়ের মাধ্যমে রসোপলব্ধির চেয়ে যাকে নিভৃতে বসে পাঠ করতে ও শুনতে ভালো লাগে। তবে ঐ ধরনের নাটকে কাব্যরসের প্রবর্তনাই প্রধান কারণ। এই কাব্যরসের গতি স্বভাবত মন্থর। এই রসশক্তির প্রাচুর্য বা প্রাধান্য নাটককে কিছুটা গতিমন্থর করে তোলা স্বাভাবিক।

নাটকের মোটামুটি যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা হ'ল—আমাদের দেশের নাট্যকারদের

মধ্যে তার অনুসরণ ও প্রয়োগ-প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য নাট্যকারদের বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক-নাটিকা রচনা করেছেন, কিন্তু ভাবাদর্শের দিক থেকে অন্যান্য নাট্যকারদের সাথে তাঁকে এক করে দেখা শুধু যে অসম্ভব তা নয়, কিছুটা অসঙ্গতও বটে। তার কারণও ঐ 'রবীন্দ্রনাথ' কথাটির মধ্যেই নিহিত।

'রবীন্দ্রনাথ' আজ বাঙালীর কাছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। এই নামে এখন একটি বিশেষ যুগ, একটি বিশেষ ভাবধারাকেই বোঝায়। আমরা রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ছায়ায় বাস করছি। রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ্বতোমুখী। তিনি একাধারে কবি, ছোটগল্প রচয়িতা, নাটক রচয়িতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচয়িতা, সঙ্গীতকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী—এবং প্রত্যেকটিতেই তাঁর অসাধারণত্ব সর্বজনস্বীকৃত। রোমান্টিক কবিমন এই অতুল ঐশ্বর্যসম্পদ নিয়ে গতিধর্মানুসরণ করে চলেছে। রোমান্টিক ভাব তাঁর প্রায় সকল রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করলেও বাস্তব তাঁর কাছে উপেক্ষিত নয়। জীবনের যে প্রশ্নগুলি কবিদৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের পূজারী কবি—কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, তাদের সার্থক রূপাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর রচনার সব মহলেই কবিমনের বিভোরতা ও গীতিময়তা সুস্পষ্ট।

অন্তর-বাইরের যে প্রভাবগুলি মানবজীবনকে নানা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বৈচিত্র্যময় করে তোলে, সেই বিচিত্রতার ছন্দোগতিতে মানবজীবন যে ভাবে আবর্তিত হ'তে থাকে, নাট্যকার ঘটনার সেই আবর্তনকে নাটকের মধ্যে রূপায়িত করতে প্রয়াস পান। রবীন্দ্র-নাট্যধারায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিলেও সেখানে চরিত্র-সংঘাত ও ঘটনা-সংঘাতের চেয়ে ভাবলালিত্যের প্রকাশ প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিয়েছে। ঘটনা দ্রুত গতিবেগের চেয়ে কাব্যময় পরিবেশের গীতোচ্ছ্বাস বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর জন্যে তাঁর নাটকে সাহিত্যরস তথা ভাবরস মুখ্য হয়ে উঠেছে, এবং সেই কারণেই তাঁর অনেক নাটক অনেক সময় অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের নাটককে Reading Drama বলা হয়েছে। কবির রচিত নাটককে নাট্যকারের রচনা বলার চেয়ে সুন্দরের উপাসক কবির রচনা বলাই যুক্তিসঙ্গত। অনেকটা এই কারণেই গতানুগতিক নাট্যরীতি আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর নাটক বিচার সম্ভব নয়।

যুগে যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তার জীবনজিজ্ঞাসারও রূপান্তর ঘটে। সেক্সপীয়রের যুগের জীবনজিজ্ঞাসা ও সমস্যা বর্তমান কালের নাট্যকারের কাছে অনেকসময় গৌণ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেদিনের কথাকে এই দিনে মনে হবে 'with little meaning though the words are strong'. পরের দিকে বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-কোলাহল যে পরিমাণে কমে এল, সেই পরিমাণে আন্তর নীরবতা অপূর্ব রহস্যমধুর রূপ ধারণ করে নতুন অর্থগৌরবে প্রকাশ পেতে থাকল। আগে যাকে

সামান্য বলে মনে করা হ'তো, পরের দিকে তারই মধ্যে মানুষ অনন্ত রহস্যের মাধুর্য খুঁজে পেল। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও রহস্যসংকেত প্রথম ধরা দিল কবিতা ও গানে,—পরে তার প্রকাশ দেখতে পাই নাটকে। এই ধরনের নাটককে Symbolical drama বা সংকেতপ্রধান নাটক বলা হয়েছে। পশ্চিম ভূখণ্ডে মেতারলিংক, ইবসেন, হাউপ্‌ৎম্যান, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি এই ধরনের নাটক রচনা করছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান এই সাংকেতিক নাটক। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রথম ও সার্থক প্রবর্তক।

বাস্তব সমস্যামূলক নাটক ও সাংকেতিক নাটকের মধ্যে অনেকে বিশেষ প্রভেদ দেখতে পান না। মেতারলিংক ত তাঁর নাটককে অবাস্তব বলতে মোটেই রাজি নন—আন্দ্রিভও নন, রবীন্দ্রনাথও নন। মেতারলিংকের 'The Sightless', 'The Blue Bird' প্রভৃতির সৃষ্ট চরিত্রগুলি কোনো অংশে অবাস্তব একথা কেউ কেউ স্বীকার করতে চান না। বর্তমান দিনে মানবমনস্তত্ত্বের বিভিন্ন ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সমস্ত জগৎ জুড়ে যে মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত, আগের চেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। আগে বেশির ভাগ মানুষ যে instinct বা প্রবৃত্তির স্তরে ছিল—যার রূপাঙ্কণ আমরা প্রাচীন যুগের সাহিত্যে পাই, আজও মানুষ সেই স্তরে থাকলেও, শিক্ষিত মানুষের মানসিক পরিধি নানারকম জটিলতার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের ideaগুলি এখন তার অনুভূতি ও রসবোধের পর্যায়ভুক্ত। এই কারণেই যেমন সেকালের নাট্যকাররা আদি, করুণ, বীর, হাস্য প্রভৃতি রস অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন, একালের নাট্যকাররাও তেমনই বিচিত্র বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ideaগুলিকে রসের পর্যায়ে উন্নীত করে নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। এসব রসও বস্তুজাত—কাজেই অনেকের মতে এদের অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রসের প্রতিভূস্বরূপ নতুন নতুন চরিত্র নাট্যকারকে সৃষ্টি করতে হয়। মেতারলিংক তাই বলেন যে এমন অনেক idea আছে যেগুলি রসের পূর্বতন স্তরে অবস্থান করছে—যেগুলি 'On their way to becoming Sentiments.' তার মধ্যে বুদ্ধির সঙ্গে যখন সহজ সংস্কারের সঙ্গত মিলন ঘটবে তখন যে নাট্যশালা রূপ নেবে তা হবে 'a theatre of peace and of beauty without tears'—অশ্রুবিহীন শান্তি ও সৌন্দর্যের রঙ্গভূমি। তার কারণ 'A truly illumined consciousness has passions and desires infinitely, less exacting, infinitely more pacific, more salutary, more abstract and more generous than an unillumined consciousness'—অর্থাৎ যথার্থ উদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ ও বাসনা—অনুদ্ভাসিত চৈতন্যের হৃদয়াবেগ ও বাসনার চেয়ে অনেক কম প্রবল এবং অনেক প্রশান্ত, সুস্থ, অতীন্দ্রিয় ও উদার।

সুতরাং সাংকেতিক নাটকে প্রবৃত্তির স্তরের রাগ-দ্বেষ-মান-অভিমানের হানাহানি

আমরা হয়ত বেশি দেখতে পাব না। কারণ সেগুলি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ স্থূল বাস্তব ব্যাপার। অপেক্ষাকৃত সাধাসিধে চরিত্র এই ধরনের নাটকে প্রায় অনুপস্থিত। রক্তমাংসের চরিত্রের মধ্যেও নানারকম জটিলতা ও নানাবৃত্তির মিশ্রণ—সাংকেতিকতার মাধ্যমেই সমুদ্ভাসিত। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের চেয়ে মানসবৃত্তিগুলির লীলাখেলা কম আকর্ষণীয় নয়। তাই মেতারলিংক, ইবসেন, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতির রচনায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব রহস্যলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। এইদিক থেকে রবীন্দ্রনাথও এঁদের সমধর্মী।

রূপক, সংকেত প্রভৃতি বললেই একটা ধোঁয়াটে আবরণের কথা মনে হয়—যার অন্তরালে থেকে যায় নিহিতার্থটি। এই আবরণ এমন একটা অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে যে কাছের জিনিস দেখাও দুর্লভ হয়ে ওঠে, আবার অনেক সময় মেঘান্তরিত সূর্যের মতোও তা ভাস্বর। যখন জ্ঞান ও বুদ্ধির অপ্রত্যক্ষ অথচ Intuition-গ্রাহ্য কোনো abstract idea-কে ভাষায় ও বর্ণে মূর্ত করে তোলা হয় তখনই রূপক, সংকেত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। একজন বিখ্যাত Symbolistএর মতে—'We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born, near as it were, and pass these lives striving to peer through its web, catch now and then visions of inexplicable thing ; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existance but delight in mocking those who perceive what we cannot.'

Symbol—emotional অর্থাৎ অনুভূতিদ্যোতক এবং Intellectual অর্থাৎ ভাবদ্যোতক দুই-ই হইতে পারে। রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যে এই দুই ধরনের Symbol বর্তমান। তবে রবীন্দ্রনাথের সংকেতপ্রধান নাটক য়ুরোপীয় সংকেতপ্রধান নাটক থেকে ভিন্ন। য়ুরোপীয় ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর নাটক স্বকীয় বিশিষ্টতায় অনন্যসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথ চল্লিশখানির উপর নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ব্যক্তিদ্বন্দ্বপ্রধান, রূপক, সাংকেতিক, গীতিমূলক, হাস্যরসাত্মক সব রকমের নাটক আছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনী নিয়ে তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করলেও গতানুগতিক ভাবে তাদের ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটক বলা সম্ভব নয়। বাইরের আবরণটুকুর ঐ নাম দেওয়া গেলেও মুখ্যত নাটকগুলি কতকগুলি বিশেষ ভাবের বাহন হওয়াতে ইতিহাস ও সমাজ ততখানি প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। প্রায়শ্চিত্ত, বিসর্জন, মুকুট, বাঁশরী, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

যাঁরা নাটকে বিশুদ্ধ বাস্তবকে খোঁজেন তাঁরা হয়ত রবীন্দ্র-নাটকে অনেক সময় বাস্তবতার আপাত-প্রতিকূল কাব্যময়তাই পাবেন। ভাবকেন্দ্রিকতা রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে রূঢ় বাস্তবের মধ্যে নেমে আসতে দেয় নি। ভাবের মধুর ও শুভ্র প্রকাশের দিকে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন। অনেকের মতে গীতিধর্মের

প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কিছুটা নিষ্প্রভ করেছে। তাঁদের মতে গীতিময়তা যতই মধুর হোক না কেন সর্বাংশে তা নাটকের সর্বগুণের পরিপূরক হতে পারে না। লিরিকপ্রধান নাটককে তাই অনেকে সার্থক নাটক বলে স্বীকার করতেই চান না। কিন্তু মানবজীবনের নানা সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে 'জন্ম রোমান্‌টিক্' কবি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেন তাতে গীতিময়তা যে কিছু পরিমাণে এসে পড়বে তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই। আর Idea-র রসপরিণতি সাহিত্যরূপে কিছুটা রসমধুর ও রহস্যময় হয়ে উঠতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলিই বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তাঁর রচিত বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, রাজা ও রানী, বিসর্জন, মালিনী, তপতী, নটীর পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, শোধবোধ, বাঁশরী, চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা, শেষরক্ষা প্রভৃতি এবং কিছু ঋতুবৈচিত্র্যমূলক নাটক ও গীতিনাট্য বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য ও শ্রীমণ্ডিত করেছে। বিসর্জন, মালিনী, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নাটকের মধ্যে আমরা একধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবতারণা লক্ষ্য করি। বিসর্জন ও মালিনী নাটক দু'খানিই স্বপ্ন-লব্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দুইটি নাটকের মধ্যে ভাবসাদৃশ্যও কিছুটা লক্ষিত হয়। এই দুই নাটকে মানুষের স্বাধীন ধর্মবিশ্বাস এবং গতানুগতিক সংস্কারের জীর্ণতা-ক্লিষ্ট ধর্মান্ধতার মধ্যে একটি সংঘর্ষ তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রচণ্ড-দ্বন্দ্ব এবং প্রাণের পরিবর্তে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমপূর্ণ শাশ্বত প্রাণ প্রতিষ্ঠায় এই নাটকগুলি একদিকে রোমান্‌টিক ট্রাজেডিরূপে অন্যদিকে শুভপরিণামান্ত নাটকরূপে সার্থকতা লাভ করেছে। সামাজিক ও কৌতুকপ্রধান নাটকগুলির মধ্যে আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি ও হাস্যকর ব্যতিক্রম সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সংকেতপ্রধান নাটকের কয়েকটিকে রূপকপ্রধান নাটকও বলা হয়। রূপক ও সংকেত বলতে এখানে Allegorical ও Symbolical বোঝাচ্ছে। রূপকের কাজ বোঝানো আর সংকেতের কাজ বাগানো। রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ, মুক্তির উপায় প্রভৃতিকে সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা হয়। এর মধ্যে রাজা, ডাকঘর প্রভৃতিকে রূপকপ্রধান বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই ধরনের নাটকের সার্থক রূপাঙ্কন ঘটেছে।

রাজা নাটকটি রূপকপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের চেয়ে এই নাটকে সাংকেতিকতা গভীর অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজা নাটকের রাজা—অরূপরতন ভগবান। রানী সুদর্শনা তাঁকে দু'চোখ ভ'রে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি পেলেন দুঃখ। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে না। যেদিন রানীর ভুল ভাঙে সেদিন তিনি বুঝলেন খণ্ডে আনন্দ নেই—আনন্দ রয়েছে অখণ্ডতায়। সুদর্শনার জীবনের ভুল 'অন্তরে বাইরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।

প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির পথ।' রবীন্দ্রনাথ বলেন '…অন্ধকারের সাধনা যাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সব স্থানেই দেখিয়া থাকেন, ভুল তাঁহার হয় না। ঠাকুরদাদা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা।' রানীও তাই ভুলভাঙার পর চরম উপলব্ধির মুহূর্তে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলতে পারেন—'তুমি সুন্দর নও, প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' মানুষ যেদিন অখণ্ডের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে সেদিনই সে পূর্ণানন্দের আস্বাদ লাভ করে। এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখা দরকার যে রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন,—গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য রচনার মধ্যবর্তীকালে রচিত। এই সময়ে কবিজীবনে যে অধ্যাত্মবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—এই নাটকগুলির মধ্যেও তা দেখা দিয়েছে। এই অধ্যাত্মবোধের মাধ্যমে কবির সত্যসুন্দরের কল্যাণরূপ প্রকট হয়েছে।

ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সার্থক রূপকপ্রধান নাটক। মানুষের জীবনে মুক্তির যে আকুলতা জাগে সেই আকুলতাই বিধাতার আশীর্বাদলিপি বহন করে আনে। মুক্তি-দূত সীমার ক্ষুদ্রতা থেকে মানুষকে অসীমের মধ্যে পরম ব্যাপ্তির মধ্যে নিয়ে যায়। ডাক-ঘরের অমল চায় সংকীর্ণতার বন্ধন কাটাতে, তাই সে বলে 'কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হ'তে হ'তে চলে যাবো—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবো।' এই খোঁজার কোথাও শেষ নেই। তার মুখেই শুনি—'খুঁজে না পাই তো আবার খুঁজব।' এই পৃথিবী যেন তার কাছে ডাকঘর। এখানে বিধাতার লিপি তারই মুক্তির বাণী বহন করে আনে। রুগ্ন অমল যেন মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক বিকারের প্রতীক। তার যে অসুস্থতা তা হচ্ছে 'সংকীর্ণ মানবজীবন' নামক অসুস্থতা। প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এই বিশেষ রোগ থেকে মুক্তি কামনা করে। অমল সহজ ভাবে জীবনও জগৎকে অনুভব করতে চায়—পেতে চায়, তাই সে বলে 'আমি পণ্ডিত হবো না। আমি যা আছে সব দেখবো—কেবলি দেখে বেড়াবো।' রবীন্দ্রজীবনাদর্শও অনুরূপ আদর্শে গঠিত। ডাকঘরের অমল গৃহরুদ্ধ বালক রবীন্দ্রনাথের যেন ছায়া। এই নাটকের 'সুধা' চরিত্রটি শিশিরভেজা ফুলের মতোই সুন্দর ও মধুর। 'ডাকঘরের' অমল সম্বন্ধে একজন বিদেশী সমালোচক বলেন 'Amal personifies man's longing for free and natural development.' অনেকে তার মনের আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু ঠাকুরদা, সুধা বা ছেলেরা পারে। মহান্ মৃত্যুর ইশারা ভেসে আসে জীবনের যে মুক্ত দ্বার দিয়ে—সেই পথে সুধার ভালোবাসাও সে লাভ করে। বন্ধন-মুক্তির আনন্দই ডাকঘরের প্রধান বক্তব্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় যথার্থই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সুরের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার

কল্পনা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন—কোথাও কোথাও সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়।'

ধর্মের ভান ও বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ 'অচলায়তন' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ধর্ম যখন আচারকে, নিয়মকে, শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে রিক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে রুদ্ধ করে। মানুষ যখনি সত্য ভাবে গভীর ভাবে মিলেছে, তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে। প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি'। সংকীর্ণ সংস্কারপূর্ণ হিন্দুসমাজই যেন একটি অচলায়তন। একসময়ে অনেকে এই নাটকটাকে উদার ও সত্যদৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'অচলায়তনের' মহাপঞ্চক ও পঞ্চক দুই ভাই। মহাপঞ্চক প্রাচীন জীর্ণ সংস্কার মেনে চলেন—আর পঞ্চক চান সেই সংস্কার থেকে মুক্তি—তিনি চান নতুনকে। শেষ পর্যন্ত সংস্কারের জীর্ণ বাঁধন ভাঙবার জন্যে গুরুর আবির্ভাব ঘটে। গুরুবেশী দাদাঠাকুর বলেন—'যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যে ঘুরিয়ে মারে, তার থেকে বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।' প্রাণহীন আচারের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির কথাই 'অচলায়তনের' মূল কথা। 'তাসের দেশ' নাটকেও তিনি এই জীর্ণ আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। যথার্থ মানুষ এসে তাসের দেশের ঘর ভেঙে দেয়—তখন সেখানে গান জেগে ওঠে—

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক,
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন নূতনেরি ডাক।

প্রাণের সাড়া পড়তেই তাসের অচলায়তনও ভেঙে পড়ে। অচলায়তনের রূপক অংশ শ্লেষাত্মক প্রকাশভঙ্গীর জন্যে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। নাটকটির নাম 'গুরু' রাখাই কবি মনস্থ করেছিলেন। পরে 'অচলায়তন' নামে নাটকখানি প্রকাশ লাভ করে।

ফাল্গুনী নাটকে বসন্তের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। এইখানে আনন্দোৎসবে যৌবনের জয়গান শুনতে পাই। কবির নানা কাব্যের সঙ্গে এই নাটকটির ভাবসাদৃশ্য আছে। ফাল্গুনী সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন—'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার

পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে, সে মৃত্যুই নয় সে জীবন।··· ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্তোৎসব করতে বেরিয়েছে, কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নাই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তার সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনবো সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী ক'রে।' মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই।···' ফাল্গুনীতে বাউল বলছে 'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। যারা মরে অমর, বসন্তের কচিপাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিক দিগন্তে তারা রটাচ্ছে, আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি।···পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব।···মানুষ তার জীবনকে সত্য ক'রে, বড় ক'রে পেতে চাচ্ছে, তাই মানুষের সভ্যতায় যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠেছে, সে ত কেবলই মৃত্যু ভেদ ক'রে। মৃত্যুকে ভেদ করে অজানার উদ্দেশ্যে জীবনতরী ছুটে চলার কথা—মরণের সিংহদ্বার পেরিয়ে আসার কথা 'বলাকা'তেও প্রকাশ পেয়েছে।

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে সাংকেতিকতা এক নতুন পথ ধরে চলেছে। এই দুইটি নাটকের মধ্যে কবির মানবমুখিতা সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান যুগের সমস্যাই নাটকদ্বয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। মুক্তধারা নাটকে শাসকশ্রেণী ও শাসিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং বর্তমান যুগের যন্ত্রের অতিরিক্ত প্রাধান্যের ইঙ্গিত রয়েছে। কবি বিদেশে যন্ত্র-সভ্যতার উগ্ররূপ দেখে এসেছেন। এখন মহাযুদ্ধোত্তর মনোভাব মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে কখনও অস্বীকার করেন নি বা অশ্রদ্ধাও জানান নি, কিন্তু মানুষের প্রাণের উপর তার উদ্ধত প্রতিষ্ঠাকে তিনি কখনও স্বীকার করেন না। যন্ত্রের বেদনাদায়ক প্রাধান্য জীবনের সৌন্দর্য নিঃশেষ করে দেয়। তাই মুক্তধারা নাটকে দেখি মানুষ 'মরীয়া' হয়ে যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেবতার সহজ, উদার, অকৃপণ দানকে মানুষ নিজের অসহজতা ও সংকীর্ণ বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই তার অমর্যাদা ঘটাতে পারে না। সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যাভিমান মানুষের জীবনে যে অকল্যাণ বহন করে আনে 'মুক্তধারা'য় কবি তাকে সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে চেয়েছেন। মানুষে মানুষে যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব সংঘাত—তার অবসান একমাত্র বৃহৎ ও উদার প্রাণ প্রতিষ্ঠায়। প্রাণ দিয়েই তবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অভিজিৎ তাই প্রাণ দিয়ে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করে গেল। 'মুক্ত-ধারা'য় একটি বিশেষ ভাব প্রাধান্য লাভ করলেও এই নাটকে নাট্যরসের অভাব ঘটে নি।

মহাত্মাজীর আন্দোলনের একটি আভাসও এই নাটকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'বিবেক' জাতীয় যে এক ধরনের চরিত্র পাওয়া যায়—মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগী তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

রক্তকরবী নাটকেও দেখি যন্ত্রদানবের প্রাধান্যে মানুষ পীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। যক্ষপুরীর রাজশক্তির প্রধান লক্ষ্য প্রজাশোষণ। ধনতন্ত্রের উন্মত্ত ও উগ্ররূপটি রাজার দলের মধ্যে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের লোভের জাল কেবল বেড়েই চলেছে। সেই লোভকে চরিতার্থ করার জন্যে তারা ফাগুলাল, কিশোর, বিশু, জগ্‌গু প্রভৃতির ওপর খবরদারি করে চলে। তাদের দৃষ্টিতে ওরা মানুষ নয়, কতকগুলি নিষ্প্রাণ সংখ্যা মাত্র। যন্ত্রের দানবীয় উল্লাসে মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানে শোনা যায় না। যক্ষপুরী থেকে প্রেম, সৌন্দর্য একেবারে নির্বাসিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাণের দুর্নিবার বেগ এসে পড়ে যন্ত্রের উপর—'লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে' প্রেমের আবেগ আঘাতের পর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যন্ত্রের দানবীয় শক্তির উপর মানবীয় প্রেমই জয়ী হয়। সেখানে নন্দিনী নামে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক নারীর আবির্ভাব ঘটে। অচলায়তনের বাধার প্রাচীর ভেঙে, মুক্তধারার বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করে, যক্ষপুরীর লোহার জাল ছিঁড়ে পৃথিবীর প্রাণভরা খুশির মধ্যে মানুষ আপনাকে বিলিয়ে দেয়। কৃত্রিমতার নাগপাশ থেকে মানুষ মহান্ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তি—প্রাণের নিত্য আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যগুলিকে ইংরাজি অপেরা জাতীয় পালা নাটক বলা যায়। বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা (গীতিনাট্য), বসন্ত, শ্যামা, ঋতুরঙ্গ, নবীন প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব রচনায় সংগীত ও নৃত্যের প্রাধান্য বেশি।

রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং পরের দিকে রাজা ও রানীর পরিবর্তিত সংস্করণ তপতী নাটকের মধ্যে প্রাণবন্ত প্রেমের সুমহান দিকটি কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সংস্কারমোহ ও প্রেমের মধ্যে প্রেমই জয়ী হবে—এই কবির ফলকথা। তবে এই নাটকগুলিতে মৃত্যুর মহিমার মধ্যে দিয়ে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়রূপ লাভ করেছে। রানীর মৃত্যুর মধ্যেই রাজা বিক্রম আত্মস্থ হবার পথ খুঁজে পান। জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতিকে জীর্ণসংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত করে। তখন রঘুপতি বুঝতে পারেন 'জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে হিংসারক্তশিখা।' মালিনী নাটকের ক্ষেমঙ্করও রঘুপতির সংস্কারে গড়া। সেখানে ক্ষমাধর্ম সুপ্রিয়ের মৃত্যুর ভিত্তিতে আপন গৌরবপতাকা উড়িয়েছে। 'তপতী' সুমিত্রা রাজা বিক্রমকে মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে মৃত্যুর হোমাগ্নির আলো দেখিয়ে। নাটকগুলির পরিণাম যতই শুভ হোক না কেন—তাদের করুণ সুরটিই প্রাধান্য লাভ করেছে।

রবীন্দ্র-নাটকে যে হাস্যরসের পরিচয় পাই তা গতানুগতিক হাস্যরস নয়। এই হাস্যরস হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন আছে। জীবনের নানা অসঙ্গতি, বাস্তব

দৃষ্টির অভাবজনিত হাসিকান্নামিশ্রিত হাস্যকর অসঙ্গতি প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের নাটকে সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে। বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাংকেতিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে Idea বা ভাবগুলিকে রসরূপ দিতে চেয়েছেন বিসর্জন, রাজা ও রানী প্রভৃতি নাটকে তার সূচনা লক্ষিত হয়। পরের দিকে মুক্ত-ধারার ধনঞ্জয়-অভিজিৎ, রাজা নাটকের রাজা-ঠাকুর্দা, ডাকঘরের অমল, ফাল্গুনীর কবি, রক্তকরবীর রাজা-বিশু-নন্দিনী-রঞ্জন, তপতীর বিক্রম-সুমিত্রা-নরেশ-বিপাশা অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভৃতিতে সেই Idea-র সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। নাটকে ঘটনাবিন্যাসের অসামান্যতা, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, চরিত্র-চিত্রণদক্ষতা, ভাবমাধুর্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণত সকলেই একটি গল্পের আকর্ষণে, বিচিত্র মানবচরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের আশায় উপন্যাস নাটক প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্র-নাটক ভাবপ্রধান বলে সেখানে উল্লিখিত আকর্ষণগুলি মুখ্য হয়ে উঠতে পারে নি। তবে রসঘন নাট্যকাহিনীতে বিভিন্ন প্রকারের মানবচরিত্রের যে পরিচয়টুকু পাওয়া যায় তাও অসার্থক নয়। ভাবধর্মী রবীন্দ্রনাথ অব্যক্তকে মধুররূপে রূপায়িত করেছেন—তিনি অরূপকে দিয়েছেন অপরূপ রূপ—মৌনকে করে তুলেছেন মুখর। অনুভূতির গভীরতা তাঁকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে। বাস্তব সীমার ঊর্ধ্বের বিশুদ্ধ আনন্দরস তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। তাই সংকেতের ব্যবহার তাঁর নাটকে বেশি। এই সংকেতগুলিই হয়েছে তাঁর ভাবের বাহন। তাঁর নাটকগুলিকে যে vehicle of ideas বলা হয় তা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। তবে তাতে action একে-বারে নেই একথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। নাটকের রীতিনীতি, প্রচলিত বিধিবিধান তিনি সবসময় মানেন নি,—নাটকের কলাকৌশলের প্রাচীন বিধানগুলিও তিনি মেনে চলেন নি। তবুও তাঁরই হাতে বাংলা নাটকের শ্রী যে অনেকখানি সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে একথা অনস্বীকার্য। ভাবকে ভাষার মধুর বন্ধনে বেঁধে তাকে কবি যে স্বভাবসুন্দর রসরূপ দান করেছেন তার আবেদনশক্তিও অসাধারণ।

বাংলা দেশে বর্তমানে অনেক নাটক রচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু সার্থক নাটকের অভাব আর পূরণ হচ্ছে না। ভালো নাটক খুঁজতে গেলেই সেই পুরানো দিনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। দুয়েকখানি ভালো নাটক যে নেই তা নয়—তবে নাটকের ইতিহাস তার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। হয়ত নতুন সার্থক নাটকের সম্ভাবনার কথা আগামী দিনের অলিখিত ইতিহাসের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে, নাটকের যে কোনো নতুন ধারা দেখা দিক না কেন—রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, তাসের দেশ, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তপতী প্রভৃতি নাটকের মতো নাটক আর রচিত হবে না—হতে পারে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা অননুকরণীয়ও বটে। তাই রবীন্দ্রনাথেই এই ধরনের নাটকের প্রথম ও শেষ সার্থক প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মন

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মনের নাগাল পাওয়া যদি অত সোজা হোতো! কারও হাতে যদি তেমন কোন ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ থাকত, যার সাহায্যে তাঁর plastic মনটা খুব বড় করে দেখা যেত আর ভাল করে পরখ করা যেত! কিন্তু তা হবার উপায় নেই। কোন্ ধাতুতে যে গড়া তাঁর মন এ কথা কেউ জানে না। তবে তা যে কোন সেরা ধাতু, যার স্পর্শগুণে সবকিছুই হয়ে উঠেছে সুবর্ণময় সজীব স্নিগ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন বৈজ্ঞানিক যদি বলেন তাঁর কাব্যগুলো জ্বালিয়ে তার *ash-content* থেকে মনের উপাদান রাসায়নিক প্রথায় বার করা চলে তো ভুল করবেন—রবীন্দ্রনাথের মনকে crystal করে পরীক্ষা করেন এমন রাসায়নিক বা পদার্থবিদ্ এখনও জন্মান নি। মানস-লোকের পথ গিয়েছে নিরুদ্দেশে। রবীন্দ্রনাথের মন তাঁর নিজের কাছে ছাড়াও ছড়িয়ে আছে তাঁর কাজের চতুঃসীমার মধ্যে। আর সে কাব্য যেখানে জন্মেছে সেখানেও কবির মন আপ্লুত। সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায়, শিলাইদহের ভাসমান বোটে, হাজার লোকের মাঝখানে, দেশদেশান্তরে, নারকেল-সুপুরি গাছের মাথায়, সরষে ক্ষেতে, কাশফুলের গুচ্ছে, ধানের শিষে, বৈশাখের ভোরের হাওয়ায়। তাঁর কাব্য তাঁর মন আবিষ্কারের অপরিহার্য পন্থা হবে। এক রবীন্দ্রনাথের হাজার লক্ষ 'মুড্' সারাজীবন ধরে তাঁর কাব্য এক এক করে মেলে ধরেছে তাঁর অন্তরের আকাশ। সেই অন্তরের আকাশই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উপরে দেদীপ্যমান চন্দ্রাতপ।

রসানুভূতির দিক দিয়ে বলতে হয় দু'চোখ দিয়ে যা তিনি দেখেছেন, দু'কান দিয়ে যা শুনেছেন মনের মধ্যে তার সুর মেলাতে তাঁর কলম চঞ্চল হয়েছে। এই সব অনুভবের সামগ্রী তাঁর মনের মধ্যে কাব্যিক রসায়নে জারিত হয়ে, হয়ে উঠেছে নতুন নতুন 'রসের এ্যালকেমির' নিদর্শন। তাঁর মন কখনও ফিলটার পেপারের মত রূপকে অপর কিছু থেকে ছেঁকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছে, কখনও বা ম্যাগনেটের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর চুম্বকী শক্তি বিস্তার করে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছে; আবার কখনও বা মাইক্রোসকোপের মত অদৃশ্য রসলোকের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অন্য কোন সময়ে তাঁর মন ইলেকট্রনের মত নিউক্লিয়াসরূপী বিস্ময়ের চারদিকে দিবারাত্রি চক্র দিয়ে চলেছে।

রসোত্তীর্ণ করে দেবার জন্য যে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা তা অনেকটা spaceএ যাবার অনুরূপ। সঙ্গীবিহীনভাবে কবি বহুবার এ যাত্রায় গেছেন সার্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে—গ্যাগারিনের মত আবার মর্তলোকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রসলোকে এই নির্ভাবনায় যাতায়াতের পিছনে অনেকদিনের অনেক প্রস্তুতি ছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর ভগীরথের মত আধুনিকতার স্রোতকে বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়ির আবহাওয়ার গুণে তাঁর কাব্য অনুশীলনের সবগুলি প্রবণতা ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণতা পায়। তাঁর বাবা কাব্যসাহিত্যকে দূরে ঠেলে রাখতেন না। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় একবার গান লিখে পিতার কাছ থেকে পুরস্কার পান। সেদিনের উগ্র সাহেবীপনার যুগে ঠাকুরবাড়ী ভারতীয় সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে এবং সেই বাড়ীর এক-একজন এক-একরকম ভূমিকায় দেখা দেন। কোন ভাই বাইরে চাকরীর জীবনে I. C. S. হয়েও মনেপ্রাণে বাঙ্গালী হয়ে রইলেন। অন্য ভাই স্বকীয়ভাবে সাহিত্যচর্চা করে বাংলা ভাষার দিগন্ত বিস্তার করলেন। কোন বোন পর্দা ভেঙ্গে বেথুন স্কুলে গেলেন। কেউ-বা ঔপন্যাসিক ভাবে দেখা দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবী অপরিণত দেওরটির কাব্যসাধনার অনুপ্রেরণা-স্বরূপ ছিলেন। বৌ-ঠানের দরবারে যে কবির হাতেখড়ি, তাঁর সিদ্ধি নোবেল-পুরস্কার লাভে।

১৮৭৪ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' বার হয়। তারপর মৃত্যুর কিছুদিন আগে ৩০ জুলাই ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ লেখা। এই সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে তিনি কত কবিতা, কত গল্প, কত প্রবন্ধ লিখেছেন তার হিসাব দেওয়া সহজ নয়। দেশের আকাশ যেমন তাকে মুগ্ধ করত তেমনি মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বজনের সাড়া পেতেন। তিনি তের বার বিদেশযাত্রায় যান। অন্তহীন দূরের অভিসার কেবল তাঁকে ডাকত। সারাজীবন ধরে তিনি কম জিনিস লেখেন নি। এ সমস্ত লেখাই তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর অনুভূতি, তাঁর ধ্যানধারণা, তাঁর চিন্তাকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। অসাধারণ স্পর্শকাতর সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি একজন আর্টিস্ট। অয়েল পেনটিং-এর মত বড় বড় তেলরঙ করা ছবি থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম পেনসিলে আঁকা স্কেচ-এর অনুরূপ কথার নানা ছবি এঁকেছেন। প্রকারভেদ তাদের অজস্র। এইসব দেখে বলতে ইচ্ছা করে এত কাণ্ড না করে তিনি যদি যে কোন একটা কিছু করতেন—নয় কাব্য, নয় গান, নয় ছবি, নয় প্রবন্ধ—তাহলেও তিনি এত বড় হতে পারতেন যে তাঁর সমকক্ষ হওয়া অন্য কারও পক্ষে সহজ ছিল না। সেই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনন্য। তাঁকে কোন ফরমূলার মধ্যে আবদ্ধ করা চলে না। সৃজনের সর্বদিকে তাঁর সব্যসাচিত্ব অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের মন বিচার করলে বলতে হয় তাঁর 'এক জনমে অনেক জন্মান্তর' ঘটেছে। শুধু তাই নয়, একই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধিক রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করেছেন। 'পঁচিশে বৈশাখ'-এ তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করেছেন "কোন কারিগর গাঁথছে, ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।" ছন্দের অন্তরালে তিনি শুধু অন্তরের আনন্দ উপলব্ধি করেন নি, আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ তাঁর মনের মুকুরে প্রতিফলিত হয়েছিল।

এক রবীন্দ্রনাথের মাঝে যে অনেক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে অধিক প্রকাশিত তিনি সৌন্দর্যপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ। সুন্দরের ধ্যানে তিনি মগ্ন। কাব্যের পেয়ালা কানায় কানায় ভর্তি করে দশকে নিমন্ত্রণ করছেন। এখানে তিনি সত্যশিবসুন্দরের পূজারী। বিশ্বমানবের কেন্দ্রীভূত সুর ও ছন্দের ছবি তিনি আজীবন ধরে ব্যক্ত করেছেন।

কাব্যে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব স্পষ্ট। তাঁর বাবামশাই-এর কাছ থেকে উপনিষদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর প্রজ্ঞার-সৌরভ ধূপের মত সর্বত্র আমোদিত করেছে। তিনি অতীতে অবগাহন করেছেন এবং ভারতবর্ষের শাশ্বত মহিমার ঐতিহ্যকে তাঁর বাণীর ভিতর দিয়ে বর্তমানে বহন করে এনেছেন। সনাতন ভারতবর্ষ তাই অতি প্রাচীন হয়েও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার কৌলীন্যে বর্তমানে সম্প্রসারিত।

তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ শুধু 'কথার রাজা' হয়ে বার হয়ে আসেন না, তিনি 'সুরের রাজা' হয়েও আমাদের সামনে আসেন। তিনি গানের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছেন। ছন্দের মত সুরকেও তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, মিলিয়ে মিলিয়ে নানা রকম সার্থক এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। একে এত গান লেখা কারও ভাগ্যে হয় না, তাতে তিনি নিজে সুর দিয়ে প্রাণবন্ত করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের মোহানায় ক্লাসিকাল সংগীতের সঙ্গে আধুনিক সংগীতের সার্থক মিলন ঘটেছে যার ফলে দেখি অদ্ভুত সব মিশ্ররাগের জন্ম হয়েছে। তারা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর ঘরোয়ানা পেয়েও তারা ঘরছাড়া অর্থাৎ সাধারণ ভাবে অসাধারণ। তাঁর অনুভূতির তন্ত্রীতে সুরের অসীমত্বকে তিনি অনুরণিত করতে পেরেছিলেন। তা না-হলে সুর নিয়ে এমন সৃষ্টি সম্ভব হোত না।

নানান রবীন্দ্রনাথের মাঝে যে বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ তিনি হলেন প্রকৃতির পূজারী, জগদীশচন্দ্রের দোসর; প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে সিদ্ধহস্ত। মাটি, মানুষ ও পৃথিবী এই নিয়ে যে জাগতিক সত্য তাদের অননুকরণীয় ভাষায় উপস্থিত করা একা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে কবি রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বিশ্লেষণী মনোভাব নিতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথার্থ মূল্যবোধ দিয়ে তিনি অনুপম সাহিত্যসৃষ্টিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

রাজনীতিচেতনাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ আর একজন ছিলেন, তিনি যদিও ভোটের জন্যে কখনও অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু তাঁর মন দশ ও দেশের জন্য সবসময়ে ব্যগ্র থাকত। প্রয়োজনে তাঁর কলম কৃপাণের মত উঁচিয়ে ধরে। তিনি হীন প্রভুশক্তির নিন্দা করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর সেই সংবেদনশীল বলিষ্ঠ মন রাজার খেতাব নিঃসংকোচে ছেড়ে দিয়ে দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের চরম বর্বরতার প্রকাশ দেখে এই রবীন্দ্রনাথই বিশ্বে শুভবুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার মহত্তম বাণী উচ্চারণ করেন যা চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। প্রাণঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্য তিনি মুসোলিনীকে তাঁরই পাঠান বই নিঃসংকোচে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পার্থক্য এইখানে রবীন্দ্রনাথ কোন সাধারণ রাজনৈতিক নেতার মত শুধু সভাসমিতি, প্রতিবাদ আর জন-আন্দোলন করেন নি। তাঁর মন ছিল সংগঠনের দিকে—তিনি আজীবন নানারকম সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনিকেতন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের আর একদিক হ'ল তাঁর চিত্রকলায় মুন্সিয়ানা। কথার ছবি ছাড়া লাইনের ছবিও তিনি আঁকেন। কবিতা সংশোধন করবার সময় নেহাৎ হিজিবিজি দিয়ে এই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের আর্ট সৃষ্টির কেরামতি দেখা যায়। চিত্রসৃষ্টির বাসনা পরে নানান রসোত্তীর্ণ ছন্দোময় রেখার সুসমঞ্জস ভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়। কবিতার মত ছবি তাঁর মন থেকে এসে কাগজে ধরা দিত। আমরা তা দেখে বিমুগ্ধ।

বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের মাঝে আর এক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমরা ভাল করে চিনি —তিনি হলেন কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলির কবি হয়েও তিনি অপূর্ব রসিকতায় আমাদের আপ্যায়ন করেন। যাঁর সরস সব মন্তব্যগুলি আজও সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান হয়ে আছে। এই রবীন্দ্রনাথই 'কবি' আর 'কবিরাজ' এর পার্থক্য বুঝতেন। ভালবাসা তাঁর কাছে 'স্নায়ুর ব্যামো' বিশেষ। বিরহের জন্য 'বিরহ নিবারণী বটিকার' কথা ভেবেছেন। তিনি আরও সমজদার, তিনি জানতেন 'হৃদয়যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরে'—তার জন্যে কি করতে কি হয়। পরিহাসতরল ভাবে বলেছেন 'আমার উইশ কি, একটি ছটাক সোডার জলে বাকি তিনপোয়া হুইস্কি।' এসব সার্থক রসিকতার দিকটা তাঁর কাব্যবিশ্লেষণের গুরুগম্ভীর ভারে হারিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকে কোনকিছুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায় না।

সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তাঁর মধ্যে একজন আধুনিক রবীন্দ্রনাথ সবসময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষের দিকে তাঁর সম্বন্ধে এই অনুযোগ করা হোতো ঃ রবীন্দ্রনাথ আর আধুনিক নেই। সেই মন্তব্য যে কত ভ্রান্ত তা তিনি তাঁর নতুন সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বারবার প্রমাণ করেছেন। সৃষ্টির তাগিদে তিনি যত আধুনিক হতে পারেন তা তাঁর সমসাময়িক কোন তরুণ সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাষাই আধুনিকতার নিশান। তিনি আজীবন নিজে বদলেছেন, ভাষাকে বদলেছেন। তিনি চিরযৌবনের ভাণ্ডারী।

এই সব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আটপৌরে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমরা, বাইরের লোকরা, খুব বেশি জানি না। তবে অনুমান করতে পারি সেই সাধারণ রবীন্দ্রনাথের অনেক চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সাধারণের অনেক মিল ছিল। এই রবীন্দ্রনাথই শিলাইদহে টেগোর এস্টেটের খতিয়ান দেখতেন। প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হতেন। ছেলেমেয়েদের অসুখে

বিচলিত হতেন। তিনি আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গ কামনা করতেন। জীবনে তিনি দুঃখ কম পান নি। আবার তাঁর কাব্য যখন যন্ত্রস্থ হোতো তখন সেই রবীন্দ্রনাথ প্রুফ দেখতেন। বর্জইস্ কি পাইকা হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। বই-এর মলাট কেমন হবে এ চিন্তাও নিশ্চয়ই করতেন। এই সাধারণ রবীন্দ্রনাথ কি দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসতেন ইত্যাদি তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়েই আমাদের পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।

সবচেয়ে যেটা অসাধারণ লাগে তা হোলো এই একই রবীন্দ্রনাথের মাঝে যে বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ তাঁরা কিন্তু একে অন্যের প্রতিপক্ষ নয় বরং পরিপূরক। সর্বাঙ্গীণ রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট হয়েছেন এইসব ভিন্ন ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের মনপ্রাণের সামগ্রী নিয়ে। সেইজন্যে এক রবীন্দ্রনাথ এত সৃষ্টিশক্তির প্রতিমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির গতিময় উল্লাসকে হৃদয়ঙ্গম করে বলতে ইচ্ছে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মন কোন একজন রবীন্দ্রনাথের মনের প্রকাশ নয়, তাঁর মধ্যে যে বিচিত্র রবীন্দ্রনাথের সমাবেশ, তাঁদের সবার মনের প্রকাশই তিনি। তাই রবীন্দ্রনাথের মন এমনই অমৃতময় বাণীমূর্তিস্বরূপ। আর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল রবীন্দ্রনাথ শুধু ৩৬৫ দিনের কবি ছিলেন না। তিনি প্রতি নিমেষের প্রতি মুহূর্তের কবি। তাই তিনি একটু একটু করে অপলক মুহূর্তকে বেঁধে অনন্তকে বাঁধতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যের রাজসিংহাসনে এই ক্ষণকালকে বসিয়ে তিনি চিরকালের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য অনুভূতির co-enzyme তাঁর কাছে মজুত থাকত, আর প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন রসমাধুর্যের স্ফুরণ তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

ছোটদের হাতে যেমন অনেক রঙ্গিন কাচের টুকরো ভরা কেলাইডোস্কোপের নাড়াচাড়াতে প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন রকমের সমাবেশ হয় তেমনি নানা রবীন্দ্রনাথের নানা-রকমের মন তাঁর জীবনদেবতার অঙ্গুলীসঞ্চালনে মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র মনের বিভিন্ন সমাবেশ ঘটেছে। জীবনদেবতার এই সৃষ্টির আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ কখনও সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী

ভবতোষ দত্ত

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন ১৮৮৬ সালে। সেই বছর প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরী একসঙ্গে একই জাহাজে যাত্রা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেবার মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আশুতোষ বিলেত থেকে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন। তখনই প্রথম প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। প্রমথ চৌধুরী সেই সময় কলেজের ছাত্র। তার আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁর শোনা ছিল। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি যখন প্রথম শোনেন তখন তাঁর বয়স আট বৎসর। তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হত জ্ঞানাঙ্কুরে। 'রবি ঠাকুর কবি কিনা'—এই নিয়ে আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনা হত। তার কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি প্রথম পড়েন। কাব্যটির নাম 'ভগ্নহৃদয়'। হেয়ার স্কুলের কোনো সহপাঠীর অনুরোধে তিনি 'ভগ্নহৃদয়' পড়েছিলেন। কিন্তু সে কাব্য তাঁর মনে কোন রেখাপাত করে নি।

কৃষ্ণনগরেই প্রথম দুজনের সত্যকার পরিচয় হল। শুধু মৌখিক নয়। প্রমথ চৌধুরী যে একজন প্রতিভাবান তরুণ, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন। তার বিবরণ প্রমথ চৌধুরীই রেখে গিয়েছেন,[১]—

"আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে দক্ষিণে একটি লম্বা চওড়া ঢাকা বারান্দা ছিল এবং তার দক্ষিণে একটি মাঝারি গোছের খোলা বারান্দা ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে দাদা ও রবীন্দ্রনাথ বসে তাল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে আসবার কিছু পূর্বে কলকাতায়, বোধহয় মেডিকেল কলেজে তাল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। আমি ঢাকা বারান্দায় অন্ধকারের ভিতর বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলুম। শুনে দাদাকে একটি প্রশ্ন করলুম। সেই রাত্রে দাদার মুখে শুনি যে আমার প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা করেন 'এ প্রশ্ন কে করলে?' দাদা বলেন 'আমার একটি ছোট ভাই।' রবীন্দ্রনাথ নাকি দাদাকে বলেন 'তোমার ও ভাইটি দেখছি অতি বুদ্ধিমান ও চতুর।' আমার সেই প্রশ্নটি ছিল এই যে—রাস্তা দিয়ে একটি ঘোড়া যদি সমান জোরে দৌড়ে যায়, তবে তার সমপদবিক্ষেপের শব্দ কি কানে মিষ্টি লাগে না?

---

১ প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা' পৃ ৭৪-৭৫

—যদিচ তার ভিতর কোন সুরস্বর নেই, আছে শুধু সমান সমান ব্যবধান।—তিনি কৃষ্ণনগরের মত পাড়াগাঁয়ে এসে, একটি রুগ্‌ণ ছোকরার মুখে এরকম প্রশ্ন বোধহয় প্রত্যাশা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।"

তারপর প্রমথ চৌধুরী কলকাতায় আশুতোষ চৌধুরীর মট্‌স্ লেনের বাড়ীতে এসে থাকেন। রুগ্‌ণ শরীরে পড়াশুনা খেলাধূলা বন্ধ ছিল। বিলেত থেকে তখনকার দিনের আধুনিক কবি রসোটি সুইনবার্নের কাব্য নিয়ে এসেছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। অনেক ফরাসী বইও এনেছিলেন। বাড়িতে বসে বসে প্রমথ সেই বই পড়া অভ্যাস করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই আসতেন। ইতিমধ্যে আশুতোষের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভাদেবীর বিবাহ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি লেখেন। আশুতোষ চৌধুরী এই বই সম্পাদনা করেন। বই ছাপা হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি আশুতোষকে পড়ে শোনাতেন। প্রমথ সেই সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনি বলেছেন,[২]—

"কবিতা বস্তুটি কি, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম। তার থেকেই আমার ধারণা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে যা হেম-নবীনের ছিল না। এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছেন তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সংগীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবতঃ আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি।"

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে তাঁদের মধ্যে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল আত্মীয়তার সূত্রে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়েন এবং আলোচনা করেন।[৩] যে যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তি সম্বন্ধে বাঙালি পাঠক নিঃসন্দেহ ছিল না সেই যুগে চৌধুরী পরিবারে রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগেই রবীন্দ্রনাথ এমন ভক্ত লাভ করেছিলেন, যিনি রবীন্দ্রযুগেই দ্বিতীয় সাহিত্য-অধিনায়ক হয়ে উঠবেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তখনও পর্যন্ত বাংলা রচনা করেন নি। ১৮৯০তে যে বৎসর তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ পাস করেন, সেই বৎসর প্রমথ চৌধুরী প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি লিখলেন 'জয়দেব'কে নিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উৎসুক ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন,[৪]

---

২ 'আত্মকথা' পৃ ৮৫-৮৬

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিঠিপত্র' ৫ম পৃ ১৩০, পত্রের তারিখ ২১ মে ১৮৯০

৪ ঐ পৃ ১৩৫ পত্রের তারিখ ৩ জুন, ১৮৯০

জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখলে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝতে পারচি নে। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

প্রমথ চৌধুরী জয়দেবকে উঁচুদরের কবি বলে স্বীকার করতে চান নি। যে সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধটি পড়া হল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কবি অক্ষয় বড়াল। তিনি নবীন লেখককে অভিনন্দিত করলেন, যদিও চিত্তরঞ্জন দাশ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত[৫] প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হন। এই প্রবন্ধটি স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অনেকাংশ বাদ দিয়ে। অনেকদিন পর সবুজপত্রে প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। এই সময় থেকে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্য নিয়ে পত্রালাপ চলে। তার কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যের কিছু আলোচনা করেন। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ সমালোচনাবুদ্ধি ও রসজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ যে তখন থেকেই মুগ্ধ ছিলেন তা বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে। এই সব লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের কতকগুলি অভ্রান্ত দিক্‌নির্দেশ আছে, যেগুলি পরের যুগের সমালোচকদের খুবই কাজে লেগেছিল। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন[৬],

"আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

'জয়দেব' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে চিন্তার স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করে থাকবেন যদিও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন মন্তব্য জানা যায় না। কিন্তু তার পর থেকেই প্রমথ বাংলার লেখক হয়ে উঠলেন। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে আযৌবন মগ্ন হয়ে থাকবার জন্যেই সম্ভবত তিনি এক নতুন রসদৃষ্টি লাভ করেন, যা বাংলা সাহিত্যের রুচির সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ জয়দেব রচনার পরেই সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় এম্পার মেরিমীর Etruscan Vase নামে একটি গল্প অনুবাদ করেন 'ফুলদানি' নাম দিয়ে। এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচনা করেন। দুই কারণে রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করেন[৭]

"প্রথমত ফুলদানির মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে; দ্বিতীয়ত

---

৫ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা সরলাকে বিবাহ করেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। ইনি আই. সি. এস হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা করেন।

৬ রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র' ৫ম পৃ ১৫০-১৫১

৭ প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা' পৃ ৯৪-৯৫

পাকা ফরাসি লেখকের লেখা কাঁচা বাঙ্গলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না সে কথা মানি নি। আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এরকম সমালোচনা আশা করি নি। তারপরেই আমি মেরিমের কার্মেন তর্জমা করি, কিন্তু সেটি শেষ করতে পারি নি বলে প্রকাশ করি নি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু ফুলদানির চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজ্‌মকে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করি নি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে শিলাইদহের পল্লীপরিবেশে বাঙালি জীবনের সুখদুঃখবেদনা নিয়ে গল্প রচনায় মগ্ন সেই সময় প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর ঐতিহ্যবিযুক্ত গল্প স্বভাবতই তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মনের সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্য তাঁকে যে আকর্ষণ করত, তাঁর নিজের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করত তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ আছে 'পঞ্চভূত' রচনায়। রাজশাহীতে সেই সময় জজ ছিলেন লোকেন পালিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গেলেন। সেখানকার সাহিত্যিক আসরে আসতেন জগদিন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায়। যে-সব বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা চলত তার থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপকরণ পেয়েছিলেন পঞ্চভূতের। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন লোকেনের সঙ্গে তর্কে তাঁর মতামতের অনুকূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জগদিন্দ্রনাথ। এই সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক রবীন্দ্রনাথ বাংলার জাতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন জাতীয়তাবাদী ও কর্মব্রতী নেতারূপে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যুগের পরিণামরূপে দেখা দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী কর্মী পুরুষরূপে পরিচিত নন। সুতরাং এই সময়ের আন্দোলনে তাঁকে সেরকম দেখা যায় না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ রচনায় বিরত ছিলেন না। সাধারণের ধারণা এই যে, প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' রূপ বুঝি 'সবুজপত্রে'র যুগের। কিন্তু সবুজপত্র প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকাতে তিনি লিখেছিলেন 'কথার কথা', 'আমরা ও তোমরা', 'খেয়ালখাতা', 'তরজমা', 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ', 'সনেট কেন চতুর্দশ-পদী'। চলতি বাংলার পক্ষে প্রমথ চৌধুরী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন ভারতী পত্রে দুটি প্রবন্ধে—'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (পৌষ, ১৩১৯) এবং 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' (চৈত্র, ১৩১৯)। বঙ্গভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ভারতীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'তেল নুন লকড়ি' নামে (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১২)। এটি সম্ভবত গ্রন্থাকারে

বেরিয়েছিল ১৯০৬-এ, পরে 'নানা কথা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তীকালের অন্য প্রবন্ধ থেকে ভাষাতে না হলেও মতামতে কিছু আলাদা। স্বদেশী যুগের প্রভাব যে তাঁর চিন্তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তিনি বলছেন,

"আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশি না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়।"

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় বহু গানে কবি স্বদেশের পায়ে আত্মোৎসর্গ করবার জন্যই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন। স্বদেশী শিল্প স্বদেশী আচার-ব্যবহার রক্ষা, স্বদেশী চিন্তা ও ভাবনার অনুসরণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও গুরু প্রবন্ধ লিখেছেন কখনও ব্যঙ্গ করেছেন, কখনও বক্তৃতা করেছেন। রবীন্দ্র-জীবনের এই দিকটা মোটামুটি সকলেরই জানা। কিন্তু তাঁর এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটাই বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বলেছেন সামাজিক সাম্প্রদায়িক অন্যান্য অনৈক্য দূর করে একপ্রাণ হয়ে উঠতে। একপ্রাণতা যদি না আসে তবে রাজনীতির প্রয়োজনেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারব না। হিন্দুসমাজে এই ভেদ ও আত্মবিরোধ ঘোচানোই দরকার হয়ে পড়েছে। সব রকম সামাজিক ভেদকে মেনে চলব অথচ বলব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক হও। এরকম আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদের বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে মাত্র। প্রমথ চৌধুরীও যেন এরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,

"যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমন কি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে, তার কোনো প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে। একটি দিক নির্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়।"

২

১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গেলেন। বিলাতে থাকতেই তিনি প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' (প্রকাশ মার্চ ১৯১৩) পড়ে ফেলেন। সেখান থেকে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে একটি বিখ্যাত চিঠি লেখেন[৮]

"বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি তো দেখি নি। এর কোন লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহুরির নিপুণ

৮ রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' ৫ম পৃ ১৬৭, পত্রের তারিখ ২২ এপ্রিল ১৯১৩

হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝক্‌ঝক্ করছে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।"

প্রমথ চৌধুরীর মত বুদ্ধিপ্রধান লেখকের কাব্যপ্রয়াস স্বাভাবিক কারণেই ভাবালুতা-বর্জিত এবং তীক্ষ্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে নাকি সেকালে 'কি-জানি-কি'-র কবি বলা হত।[৯] রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা সম্পর্কেই শুধু নয় বলাকার যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের উপভোগ' (১৩১৪ মাঘ) নামে প্রবন্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগ সত্য হোক অথবা মিথ্যাই হোক রবীন্দ্রকাব্যের নিশ্চয়ই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল যার মধ্যে এই অভিযোগের সুযোগ ছিল। সেদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য ছিল রবীন্দ্রকাব্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রীতির। শুধু বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্যই নয়, প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতে ও শব্দ ব্যবহারে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল। অকাব্যিক শব্দের ব্যবহার করে প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই রবীন্দ্ররীতির সচেতন বিরুদ্ধাচারণ করছিলেন। ব্যঙ্গপরায়ণতা তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতার আবেশকে বিনষ্ট করাই এর লক্ষ্য। এই সব রবীন্দ্র-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর কবিতার গুণগ্রহণে কার্পণ্য করেন নি। আমাদের মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতারও সমান প্রশংসা করেছিলেন।[১০] দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাও ছিল রবীন্দ্ররীতির বিরোধী এবং নিবিষ্ট পাঠক জানেন প্রমথ চৌধুরীর কাব্যের সঙ্গে একই গোত্রে ফেলা কিছু অসঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রানুগামীদের বিরাগভাজন হলেও প্রমথ চৌধুরীর কাছে শ্রদ্ধা হারান নি। তার প্রমাণ আছে 'পদচারণ' কাব্যের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতায় (ভাদ্র ১৩২০)। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্তত দুটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন।[১১] 'নারায়ণে'র প্রতিপক্ষ সবুজপত্রে এই দুটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। পাঠকের কাছে ঔদার্য প্রতিপন্ন করার জন্য তা নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত একাত্মতা অকৃত্রিম ছিল তাতে সন্দেহ করি না। এ কথা জোর দিয়ে বলবার কারণ রবীন্দ্রনাথকে প্যারডি করে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের আনন্দবিদায়ের দক্ষযজ্ঞের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সমালোচনা করতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। সেই প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যে চাবুক' (রচনাকাল মাঘ ১৩১৯)।

---

৯ প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা' পৃ ৯১

১০ দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা'র আলোচনা করেন ১৩০১ অগ্রহায়ণের 'সাধনা' পত্রিকায়; 'আষাঢ়ে'র আলোচনা করেন ১৩০৫ অগ্রহায়ণের ভারতীতে; 'মন্দ্রে'র আলোচনা করেন ১৩০৯ কার্তিকের বঙ্গদর্শনে।

১১ সবুজপত্র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ এবং সবুজপত্র ১৩২৩ আষাঢ়

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করবার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের সম্পর্কেও একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন। বিলাত থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসেন ৬ই অক্টোবর ১৯১৩ তে। শান্তিনিকেতন থেকে ২৬-এ অক্টোবর তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন,[১২]

"তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাও দেখি—কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। · তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি।·· সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে।"

এর কিছুদিন পর প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত পত্রিকা 'সবুজপত্র' বেরল। সবুজপত্র রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করল। ১৩২১-এর বৈশাখ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ এতে কবিতা দিলেন 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা'। তারপরে রবীন্দ্রনাথ এতে বহু বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছেন। এ কথা অবশ্য সত্য 'বলাকা'র যুগে রবীন্দ্রমানসের যে নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হল তার পূর্বসূত্র রবীন্দ্রকাব্যে পূর্বেই ছিল। কিন্তু 'সবুজের অভিযান' প্রভৃতি রচনায় যে কবিচেতনার উদ্দামতা আছে, তা কিছু আকস্মিক বলেই মনে হয়। এর মূলে কিছু প্রতিক্রিয়া থাকা অসম্ভব নয়। যেমন তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন,[১৩]

"আমাদের বর্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই—বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ—কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্যের দরকার—যেখানে শয়তানের সঙ্গে লড়াই যে শয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখতে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে নিচ্চে। তোমাদের এই সব লেখা পড়ে উৎসাহ হয়।"

আশ্চর্যের বিষয় এ দিকে সবুজপত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এত উৎসাহ, অথচ ব্যক্তিগত-ভাবে কবি ক্লান্ত এবং অনুভব করছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম শেষ হয়ে এসেছে,[১৪]

"মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে

---

১২ চিঠিপত্র ৫ম পৃ ১৬৯ পত্রের তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৩। খুব সম্ভবত এই তারিখ মুদ্রণ-ভ্রান্ত। রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ডের তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৯১৩ [১০ কার্তিক ১৩২০] দ্রষ্টব্য পৃ ৩৩৪ পাদটীকা।

১৩ চিঠিপত্র ৫ম পৃ ১৭৮ পত্রের তারিখ ১৩২১, ২২ জ্যৈষ্ঠ

১৪ চিঠিপত্র ৫ম পৃ ১৮৯

রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে—এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করি।"

বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাশক্তির প্রভূত প্রশস্তি করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মুক্ত চিন্তা আমাদের পুরনো চিন্তাভঙ্গিকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছিল। মতামতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রমথ চৌধুরীর এই স্বতন্ত্রতা ছিল নিজেরই সৃষ্টি। বিদেশী সাহিত্য থেকে তিনি এর আদর্শ ও শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের আত্মস্মৃতি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও বিকাশের ধারা আছে যা আমাদের সমাজ ও দেশের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মননবিকাশের স্তরগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-র য়ুরোপভ্রমণের পর যে নূতন দৃষ্টি লাভ করলেন, সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে মানবত্বের যে বিরাট এবং প্রশস্ত মূল্যবোধ উপলব্ধি করলেন, প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। তার প্রমাণ 'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' প্রবন্ধটি। প্রথম মহাযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ অবিমিশ্র দুঃখ বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় দুঃখ-নিশার আসন্ন অবসানের আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে। মানবসভ্যতার যুগান্তর এসে যাচ্ছে বলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধেও ঠিক এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী আমাদের দৃষ্টিকে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বিদেশী সাহিত্য ইতিহাসের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে বলেছেন। সবুজপত্র এই নূতন জগতের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছিল। চলতি ভাষা স্বীকার তো তার একটা দিক মাত্র। চলতি ভাষায় শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে নামিয়ে আনা হল মাত্র, যে শিক্ষা ছিল সাধুভাষার গ্রন্থে বদ্ধ। সবুজপত্র বলল শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাত্যহিক জীবনে ভদ্র হওয়া রুচিমান হওয়া এবং বুদ্ধিকে শাণিত করা—বিবিধ বিদ্যাকে আয়ত্ত করে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নতুন সভ্যতা ও সমাজের উপযোগী হওয়া। অতুলচন্দ্র গুপ্ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বঙ্কিম-কথিত সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সমঞ্জস করা নয়, চরিত্র গঠন করাও নয়; উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ করে সভ্য হওয়া[১৫]। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী বললেন, পুরনো দর্শন দিয়ে আমাদের আর চলবে না।[১৬] ভারতীয় বা পাশ্চাত্য প্রচলিত দর্শনের জায়গায় এ যুগে নতুন দর্শন সৃষ্টি করতে হবে। বরদাচরণ গুপ্তের লেখার প্রশংসা

---

১৫ সবুজপত্র ১৩২৩ ফাল্গুন 'শিক্ষার লক্ষ্য'

১৬ সবুজপত্র ১৩২২ শ্রাবণ ও পৌষ 'নব্যদর্শন'

বিশেষভাবে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'নতুন কিছু' করতে হবে।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ এই নতুন বুদ্ধিবাদের আন্দোলনে যোগ দিলেন। 'বলাকা'র কবিতায় নতুন মূল্যবোধের কথা বললেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সমালোচনা করলেন ঐতিহ্যাকৃষ্ট জাতীয়তাবাদকে। 'ভাষার কথা'[১৮] প্রবন্ধে নতুন চলতি ভাষার আদর্শকে সমর্থন করলেন যদিও প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। তবে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এখানেই যে প্রথমোক্ত জন মূলত Essayist কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনদার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় বুদ্ধির বাধা অপসারণ করতে চেয়েছিলেন—ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এই ব্যক্তিচেতনা দিয়েই সমস্ত মানবজাতি বুদ্ধির ক্ষেত্রে এসে মিলিত হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই সমগ্রতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছিলেন।

"পুনশ্চ"র কবি রবীন্দ্রনাথ

সুলেখা দে

পঞ্চম বর্ষ, সাহিত্য

রবীন্দ্রকাব্যের একটি বৃহৎ অধ্যায় "মহুয়া"তে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। 'পরিশেষে' তার উপসংহার। কিন্তু তারপরেও কবির বক্তব্য শেষ হ'লো না। আবার নতুন করে সুরু হ'লো 'পুনশ্চ' দিয়ে। 'পুনশ্চ'তে কবি যে নতুন গদ্যছন্দের প্রবর্তন করলেন তা শুধুমাত্র ছন্দ বা আঙ্গিকগত পরিবর্তন নয়, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেও তা নবীন ব্যঞ্জনাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই রীতিপরিবর্তনের পশ্চাতে কবির মননকল্পনার ঋতুপরিবর্তনেরও অনুপ্রেরণা ছিল। যৌবনবসন্তের পুষ্পসম্ভার তখন প্রৌঢ়ত্বের পরিপক্ক ফসলে পরিণতি লাভ করেছে। কল্পনার রোমান্স থেকে কবির দৃষ্টি এসে পড়েছে প্রতিদিনের তুচ্ছ, খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর বাস্তবজীবনের রোমান্সে। জীবনের বহুবিচিত্র ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতালোকে কবি মানবজীবনের সত্যকে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। বিচিত্র দুঃখবেদনার মধ্যে কবি জীবনের জটিলতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—দেখতে পেয়েছেন আধুনিক যন্ত্রযুগের

---

১৭ সবুজপত্র ১৩২৩ মাঘ 'নতুন কিছু'

১৮ সবুজপত্র ১৩২৩ চৈত্র

বেদনাকে। কবির কল্পনা বিচরণ করেছে বৃহত্তর জনমানসের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে। নতুন যুগের নতুন সমাজচেতনাতে। পুরাতন কাব্যসংস্কার বর্জন করে কবি এতকালের পরিত্যক্ত অন্ত্যজ ব্রাত্যকে তার কাব্যের প্রাঙ্গণে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। বাস্তবের পটভূমিকাতে দণ্ডায়মান কবির নিরাসক্ত ও নির্মোহ জীবনসমালোচনা এই কাব্যে যে নবতর তাৎপর্য বহন করে এনেছে তাই কবির উত্তরকাব্যের ভূমিকারূপে বিরাজ করছে। দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান নিরাভরণ দৃপ্ত পৌরুষের প্রতীক এই গদ্য-কবিতাতে যে বলিষ্ঠ আচারমুক্ত ও সরল সত্যবোধের স্বাদ সঞ্চারিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব।

এই বাস্তবসচেতনতা ও মানবিকতা ছাড়াও কবির পূর্বতন নিসর্গপ্রীতি ও রোমান্টিক স্মৃতিসঞ্চরণের চিহ্নও এ কাব্যের মধ্যে স্থানলাভ করেছে। এ যুগের নিসর্গপ্রীতি আরেকবার 'ছিন্নপত্র' ও 'চৈতালি'র যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র সুদূরাভিসার অথবা সৌন্দর্য উপলব্ধির তত্ত্বকে কবি এখানে প্রাধান্য দেন নি। চিত্রধর্মী বাস্তবদৃষ্টিতে নিরাসক্ত নিসর্গ-উপভোগ করবার দৃষ্টান্তই এ কাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে। পদ্মাতীরের শ্যাম-সমারোহ, কোপাই নদীর শীর্ণ পাণ্ডুরতা আর বীরভূমের রাঙামাটির গৈরিক স্পর্শ কবির অন্তরে ধূসর বৈরাগ্যের ছায়া সঞ্চারিত করে দিয়েছে।

কবি সাধারণ মানুষের আনন্দবেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র কাহিনী—আর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কবিমানসের সমবেদনার কোমল স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস অতুলনীয় ছোটগল্পের সৃষ্টি করেছে—তাই গদ্যছন্দের সুবিস্তৃত বাহন অবলম্বনে কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ও বাস্তবতার মধ্যে বিচরণ করেছে। গার্হস্থ্য চিত্রের মধ্যে সর্বকালীন চরিত্রের উদাহরণ মেলে 'অপরাধী' 'ছেলেটা' 'বালক' 'একজন লোক' 'সহযাত্রী' 'বাঁশি' এবং 'শেষ চিঠি'তে। প্রথম তিনটি কবিতায় শিশু মনস্তত্ত্বের অপূর্ব উদ্‌ঘাটন। শিশুর দুষ্টুমির মধ্যে দুঃসাহসিকতা, প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নতুন অভিজ্ঞতা আহরণের কৌতূহল—কিঞ্চিৎ কল্পনাপ্রবণতার সমন্বয়ে অপরূপ কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। এই কবিতাগুলিকে ঠিক ছোটগল্পের কাব্যরূপ হয়তো বলা যাবে না। এদের লিরিক আবেদন আরো বেশী স্পষ্ট, আরো গভীরতর। কাহিনী অবলম্বনে সৃষ্ট এই কবিতাগুলিতে ঘটনার চেয়ে চরিত্রবিশ্লেষণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। "আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ বলে ভালমন্দ পেরিয়ে"—এই সহজ সত্যদৃষ্টি ও ব্যাপক মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ কবি মানুষের অন্তর্লীন মহত্তর সত্তার স্বরূপসন্ধানে ব্যগ্র হয়েছেন। 'সহযাত্রী' 'একজন লোক' কবিতার মধ্যে বাইরের অসামঞ্জস্যের মধ্যে মানবের গোপন অন্তরকে কবি রং ও রেখার সমন্বয়ে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। বাঁশিতে কবি বহির্জগতের নিত্যসংঘর্ষে ক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত মানুষের অন্তরের চিরন্তন মিলন-স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছেন।

আধুনিক প্রেমজীবনের জটিলতার পরিচয় রয়েছে 'সাধারণ মেয়ে' 'ক্যামেলিয়া' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' ও 'পত্রলেখা'তে। কিন্তু সেখানে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বাপ্নিক দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবের পরুষস্পর্শে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। চিত্রধর্মী বাস্তব-দৃষ্টিতে, নিরাসক্ত কাঠিন্যে কবি বিশ শতকের প্রেমজীবনের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। কবি একালের সমাজের অবহেলিতা 'সাধারণ মেয়ে'র বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন—যে মেয়ে 'শুধু বিদুষী' বলে নয়, নারী বলে তার ন্যায্য অধিকার কামনা করেছে। বাস্তব-জীবনের বেদনাতে কবি প্রেমের অগৌরব ও করুণ পরাভবকে লক্ষ্য করেছেন। এই নিদারুণ মানসিক দৈন্য ও লজ্জার ইতিহাসের মধ্যে কবির নির্মম সত্যদর্শনের অভিজ্ঞতা। 'ক্যামেলিয়া'র মধ্যেও প্রেমসম্পর্কে বিদ্রূপের সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ কবিতার নায়ক উপলব্ধি করেছে—'আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' থেকে ভেসে আসে 'কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ—মূর্ছিতের নিঃশ্বাসের মতো'। বুঝতে কষ্ট হয় না পরিবেশের লৌহশাসনে সন্ত্রস্ত অবমানিত মানবাত্মার ব্যর্থ প্রেমের সেই হাহাকারকে।

উল্লিখিত কবিতাগুলির সঙ্গে 'মহুয়া' কাব্যের প্রেমসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করলে প্রেম সম্পর্কে কবির মানসিক দৃষ্টি পরিবর্তনের চিহ্নটি সুস্পষ্ট হবে। আধুনিক নগর-জীবনের জটিলতা, বাস্তবের ধূলিধূসরিত বেদনাতে, সামাজিক ব্যবধান আর স্বার্থের সংঘাতে, দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার মধ্যে প্রেম তার সহজ উৎসারের পথটি খুঁজে পায় নি। প্রেমের দুঃসাহসিক অভিযান, দুর্জয় স্পর্ধার রূপটি তাই "পুনশ্চ" কাব্যের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। প্রেমের সেই অবমাননার মধ্যে আধুনিক যন্ত্রজীবনের ট্রাজেডি সত্যের নির্মম সূর্যঝলকে ঝলসিত হয়ে উঠেছে।

বর্তমানের মধ্যে চিরন্তন সৌন্দর্য সন্ধানের প্রচেষ্টা এবং ফেলে আসা রোমান্টিক স্বপ্নলোকের জন্যে দীর্ঘশ্বাসের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে 'পুকুরধারে', 'ফাঁক', 'দেখা', 'সুন্দর', 'মূর্তি', 'শেষদান' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। মনের ক্ষণিক অগভীর উচ্ছ্বাস—চলমান মুহূর্তগুলি অর্ধসক্রিয় অন্তর্লোকে যে মোহ সৃষ্টি করেছে গদ্যকবিতার আঙ্গিকে তারই কোমল বর্ণবিলাস। চিত্রসৌন্দর্যসৃষ্টিই কবির একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে। নগ্ন নিষ্ঠুর বাস্তব পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা থেকে রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকে কবির চকিত অপসরণ ঘটেছে। অতিক্রান্ত যৌবনের স্মৃতিতে ছড়ানো রয়েছে অনেকে মায়া আর স্বপ্নের মোহ। সেই স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে কবি চিরন্তন রূপের সন্ধান করে ফিরেছেন। বৈরাগ্যের ম্লান আলোকে কবি খণ্ডকালের মধ্যে এক সামগ্রিক জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। নিরাসক্ত আবেগমুক্ত ও শান্তচিত্তে নিরুত্তাপ জীবনসমালোচনা করেছেন। আকাশবাণীতে সর্বকালের নেপথ্য থেকে ভেসে এসেছে গৌড়সারঙের আলাপ। আর কবির চোখে পড়েছে—

"সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।"—(বাসা : পুনশ্চ)

কল্পচিত্রের সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে গিয়েও কবি তার বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে অতিমাত্রাতে সচেতন থেকেছেন। বাস্তব জীবনদর্শনকে পরিত্যাগ করেন নি। কঠিন বাস্তবের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার তৃষ্ণা কবির প্রবল হয়ে উঠেছে। মন চেয়েছে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরের বাসার স্বপ্ন দেখতে। কিন্তু কবি জানতেন সে বাসা কোনদিনই বাঁধা হবে না। রোমান্টিক স্বপ্নলোকের সন্ধানে উধাও হওয়া সম্ভব হয় নি—কবির সুপক্ক অভিজ্ঞতাপ্রবণ বাস্তবনিষ্ঠার আঘাতে সেই স্বপ্নের সৌধ চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

জীবনের সত্যমূল্যের নিরাসক্ত অন্বেষণের কালে 'ফাঁক' কবিতার কবি বার্ধক্যে কাজভোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যের বিস্মৃতির ফাঁক দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবজীবনের চঞ্চল ও বেদনার্ত মুহূর্তগুলি কবির প্রাণে প্রবেশলাভের পথ খুঁজছে—'দেখা' ও 'সুন্দর' কবিতায়।

মননপ্রধান জীবনদৃষ্টি নিয়ে কবি যথার্থরূপে বস্তুসত্যের নিকটবর্তী হয়েছেন—দুরূহ কাব্যকর্মে আপন রসজ্ঞতা ও শিল্পদৃষ্টির প্রমাণ রেখেছেন। সত্তর বছরের খেয়ায় উঠে বসা চলতি মুহূর্তগুলি ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে অমর হয়েছে। সেখানেই জীবন সম্পর্কে কবির নির্মোহ ঔদাসীন্য—বাস্তব সত্যদর্শন ও গভীরতর প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির কাব্যে ফুটেছে আধুনিক জটিল জীবনের প্রতিচ্ছবি। যন্ত্র-যুগের যন্ত্রণা। তারই পটভূমিকাতে ব্যক্তিমূল্য বিশ্লেষণের দুঃসাহসিক প্রয়াস কবির।

জীবজগতের প্রতি আত্মিক আকর্ষণের যে পরিচয় 'সোনার তরী' 'চৈতালি' কাব্যে প্রকাশিত, পরবর্তীকালে 'আকাশপ্রদীপে'র 'পাখির ভোজ' ও 'বেজি'—'আরোগ্যে'র 'চড়ুইপাখি'—'পুনশ্চর' শালিখ মাকড়সা রাস্তার কুকুর এমনকি গুবরেপোকা পর্যন্ত কবির সেই অপরূপ সহমর্মিতার বিস্তার। সুন্দর ও কুশ্রীর মধ্যে জীবনকে গ্রহণ করার অমিতবীর্য ছিল কবির। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে তাই বাস্তবের পরুষতা, রিক্ততা ও রুক্ষতার মধ্যেও কবি প্রাণের দুর্লভ মহিমাকে আপন হৃদয়ের গভীরে নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রদর্শনের তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে 'শিশুতীর্থ' 'তীর্থযাত্রী' 'মৃত্যু' 'বিচ্ছেদ' 'বিশ্বলোক' 'চিররূপের বাণী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। কবির কল্পনা বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য, মানবসত্তার দুর্জ্ঞেয়তা, প্রকৃতি ও মানবের যোগসূত্র প্রভৃতি গভীর দার্শনিকতা ও অধ্যাত্মরহস্যের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছে। নবতর প্রত্যয়ে উজ্জ্বল কবির সত্যনিষ্ঠ আত্মবিশ্লেষণরূপে এই কবিতাগুলি এক মৌলিক মূল্যবোধে সঞ্জীবিত হয়েছে। এপিক কল্পনার ঐশ্বর্যকে গীতি-

কবিতার সীমিত ধ্বনিপ্রবাহ বিধৃত করার মধ্যেই কবির মননকল্পনার বিশ্বব্যাপী প্রসার, উপলব্ধির দুরবগাহতা আশ্চর্য মহিমা লাভ করেছে।

মানবের আদর্শের চরম লক্ষ্য আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। তাই রক্তকলঙ্কিত প্রলয়লগ্নেও কবিহৃদয় জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি। জীবনের সূর্যমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কবির কণ্ঠে বজ্ররবে ধ্বনিত হয় নবচেতনার প্রতিজ্ঞা। জীবনের রক্তনদীর তীরে দাঁড়িয়ে উদাত্তস্বরে তাই তিনি ডাক দিয়েছেন দানবজয়ী মানবের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণপুরুষকে। সংশয়ে যাকে আমরা অস্বীকার করি, ক্রোধে যাকে হনন করেছি—তাকে প্রেমের শক্তিতে গ্রহণ করার লগ্ন এসে গিয়েছে। অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে উপনীত হবার কথাই 'শিশুতীর্থে'। 'মৃত্যু'তে কবি বলেছেন চিরপরিবর্তনশীল জগতের গতিবেগকে প্রবহমাণ রাখার জন্যই মৃত্যুর সার্থকতা। মৃত্যু হলো নবজীবনের সূচনা—অমৃতের প্রথম পদক্ষেপ। মৃত্যু সম্পর্কে কবির এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী 'শেষ সপ্তকে'র ৩৯, ৪০ সংখ্যক কবিতাতেও প্রকাশিত। সেখানে মৃত্যুরাখাল তার সৃষ্টিকে চরিয়ে নিয়ে চলেছে নব নব চারণক্ষেত্রে। 'বিশ্বলোকে' কবির দুঃখজয়ী মনোভাব দৃঢ় ঋজু ও বলিষ্ঠ রেখাতে ফুটে উঠেছে। লৌকিক দুঃখের অলৌকিক রসপরিণতির কথা ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিষদিক রসধারাতে পরিপুষ্ট কবি দুঃখের মধ্যে বেদনার মধ্যে অমৃতের তপস্যার কথা প্রচার করেছেন এবং দুঃখ অভিহত ঐহিক সুখাসক্ত মানবের সংকীর্ণতা ও হৃদয়দৌর্বল্যের অসার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন—

"এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনই
তখনই সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।"—(বিশ্বলোকা : পুনশ্চ)

প্রাচীন কাহিনীতে শাশ্বত সত্যের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়—'প্রথম পূজা' 'শাপমোচন' 'মানবপুত্র' 'রংরেজিনি' 'প্রেমের সোনা' 'স্নানসমাপন' 'শুচি' 'মুক্তি' কবিতাতে। এই আখ্যায়িকামূলক কবিতাগুলি অনিবার্যভাবে 'কথা ও কাহিনী'র অনুরূপ কবিতাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন এ সকল কবিতার প্রেরণা। কবিতাগুলির মধ্যে গল্পের আকর্ষণ রয়েছে এবং নিপীড়িত মানবের মুক্তির কথা অনুপম চিত্রসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে।

মৃত্যুমাঝে, অশ্রুমাঝে···

শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

তোমার বন্দনাগানে মুখরিত আকাশ বাতাস,
শহরে-বন্দরে। সমুদ্রের পাড় হ'তে পাড়ে
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি' ফিরিতেছে দিকে দিগন্তরে
একটি মধুর নাম। অন্তর-প্রীতির সরোবরে
স্নান করি' বিকশিছে নন্দনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস
সদ্যস্ফুট পদ্মসম। আনন্দের অশ্রুজলে হেসে,
প্রেয়সী ধরণী তব আনিয়াছে তোমার উদ্দেশে
আপন পুষ্পের অর্ঘ্য।

হে কবি রবীন্দ্রনাথ,
জীবনে দিয়েছ তুমি যে পরশ, সৌন্দর্য-আস্বাদ,—
মর্ত্যের অমর্ত্য আত্মা, তাই মোর থাকুক সম্বল,
জীবনে-মরণে। মোর ভালবাসা হোক্ অশ্রুজল
আর্ত মানবের তরে,—যে তোমার আত্মার আত্মীয়,
(তারি পাশে ঋজুরূপে থাকিবার শক্তি মোরে দিও)
ভাষা যার মৌন, যার কণ্ঠ রুদ্ধ করি' করতালি
ধ্বনিতেছে নগরীর সভাঙ্গনে, নৃত্যচ্ছন্দে মাতি,—
ভগ্নবক্ষ যে রমণী নিদ্রাহারা জাগিতেছে রাতি।
শহর-শিখরে ঐ আত্মদম্ভী বিজলী-সম্ভার
ম্লান করি' সে ক্রন্দন গগন কাঁদায় তোলে ; যা'র
বক্ষের সন্তান কাড়ি' রক্তের উল্লাসে মাতে সবে ॥

মোর ঘৃণা উঠুক না তোমার সংকেতে, অভ্রভেদী,
অশুভ, অসত্য সর্ব দানবের সিংহাসন ছেদি'।

তোমার তপস্যা, সেই মহাবিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী,
তোমার সঙ্গীত এই শ্রাবণ-রাত্রির ঝিনিঝিনি,

উতল ফাগুন-প্রেম, বৈশাখে ভৈরব-মন্ত্র,—জানি
আমার ভুবনে সত্য ভুমার আনন্দ দিবে আনি'
পুনর্বার।
দুঃখের দুর্বহ ব্যথাভারে
অবনত শির যবে হৃদয়েরে অভিশাপ হানে,
সেদিন নতুন প্রাণমন্ত্র শুনি' সব কানে কানে,
আনন্দ-ভুবন-দ্বারে। হে অন্তরতম কবি, বন্ধু, চিরন্তন তোমারে
মুমূর্ষু নরের রাজ্যে ফিরে চাই যুগে যুগান্তরে,—
মৃত্যুমাঝে, অশ্রুমাঝে, জীবনের সৌরভে ঝংকারে॥

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা

রাখালচন্দ্র নাথ

পঞ্চম বর্ষ, সাহিত্য

"আমি বারবার এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করতে চাই। ভারতের অপরিমেয় দারিদ্র্য ও গ্লানি সত্ত্বেও আমি ভারতের প্রতি ধূলিকণাকে ভালবাসি।"—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু ভাবতে, লিখতে বা কিছু বলতে গেলেই আমাদের মনে হয় যুগোত্তীর্ণ তাঁর কাব্যের কথা, উপন্যাসের কথা, তাঁর হীরের টুকরো ছোটগল্পের কথা। কিন্তু তিনি যে ভারতের এক বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করে ভারতের চিন্তাকে তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, বা তিনি যে কত বড় মানবপ্রেমিক ছিলেন, দেশের মাটির প্রতি ধূলিকণাকে পর্যন্ত তিনি কত ভালবাসতেন সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ সুস্পষ্ট নয়। আমার মনে হয়, এর জন্য আমাদের জাতীয় ভাবালুতাকে দায়ী করা যেতে পারে। আমাদের সাধারণ পাঠক বা লোকের ধারণা—রবীন্দ্রনাথ কবি, সুতরাং অবাস্তব স্বপ্নই হবে তাঁর উপজীব্য। তাই অনেক সময় আমরা মনে করি যে রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতি-বিদ্ বা দেশপ্রেমিক আখ্যা দিলে তাঁর 'বিশ্বকবি'র মর্যাদায় চূড়ান্ত আঘাত হানা হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁর দান অসামান্য, শান্তি ও প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর দান হয়ত বা আরও বেশী।

১৯৮৪ সাল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশের দরদী প্রাণ তখন পূর্ণ স্বরাজের কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। সরকারী অফিসের দু'একটি চাকরি পেলেই উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয়গণ নিজেদের কৃতার্থ মনে করতেন। ইংরেজ সরকারের কাছে শিক্ষিতরা যখন ধর্না দিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপবাণে এই মনোবৃত্তিকে ধিক্কৃত করেছিলেন।

"হাতে কলমে" এই সময়কার লেখা। এই পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন, "আমরা পথে সংকোচে ইংরাজকে পথ ছেড়ে দিই, অফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে জোড় হস্তে তাকে মা বাপ বলে তাহার নিকট উমেদারী করি ও তাহার খানসামা রসুল বক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ সাহেব বলিয়া, চাচা বলিয়া খুসী করি। ইংরাজ আমাদিগকে সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়—ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদের অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না। সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও।" ১৮৮৪ সালে এইরূপ ভাষায় ইংরাজ চরিত্র উদ্‌ঘাটন করা বিস্ময়কর বৈকি। এর কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথ "দুরন্ত আশা" কবিতায় এই একই ভাব প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন,

"দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি ঘৃণায়—মাথা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘর।"

জাতির ললাটে ইংরাজ যে দুরপনেয় কলঙ্কতিলক এঁকে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই বিরুদ্ধে অবিরাম জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। "ইংরাজ ও ভারতবাসী", "ইংরাজের আতঙ্ক", এবং "সুবিচারের অধিকার" প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। এতদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাবলোকের অধিবাসী; স্বপ্নের মায়া-অঞ্জন তাঁর চক্ষে। সুরের জাল বুনে চলেছিলেন অফুরন্ত। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। একদিকে অগণিত লাঞ্ছিত মানুষের আহ্বান, আর একদিকে সুরলক্ষ্মীর আমন্ত্রণ। কবি উৎপীড়িত মানুষের আহ্বানেই সাড়া দিলেন:

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী।···

……শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি,—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।"

এই সময় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "রাজা ও প্রজা" প্রকাশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র দংষ্ট্রাঘাতে ভারত কিরূপ জর্জরিত ও বিপন্ন তা ফুটে উঠেছিল এই প্রবন্ধে।

তারপর এলো বিখ্যাত ১৯০৫ সাল। এই সময়ের ইতিহাস প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মনে রক্তের আখরে আঁকা রয়েছে। ইংরাজ সরকার তো বিভেদনীতি অনুসরণ করে আসছিলেন রাজত্বের গোড়াপত্তন থেকেই। পূর্ববঙ্গবাসীদের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার মূলে আঘাত হানবার জন্য বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র করলেন ইংরাজ সরকার। ভারতের বড়লাট তখন কুখ্যাত লর্ড কার্জন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘোষণার পূর্ব থেকেই বাংলার প্রত্যেক দিক থেকে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। "অবস্থা ও ব্যবস্থায়" রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের ভেদনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। বৃটিশ পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবার পণ নিলেন বাংলার জনগণ। রবীন্দ্রনাথ এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। স্বদেশীযজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও বিপ্লবী অরবিন্দ।

ইংরাজের কলমের আঁচড়ে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কিন্তু বাঙালী এক জাতি, এক প্রাণ। সরকারী নির্দেশ জাতি মেনে নেয় নি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মনের ভাব ব্যক্ত করে "বঙ্গবিভাগ" প্রবন্ধ লিখলেন: "আমরা প্রণয় চাহি না। প্রতিকূল অবস্থার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিও না, আরাম আমাদের জন্য নহে, নির্ভরশীলতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিও না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ, জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব।" রবীন্দ্রনাথ হয়ত বিশ্বাস করেছিলেন, আঘাত ও বেদনার মধ্য দিয়ে জাতির চৈতন্য হবে এবং পাল্টা আঘাত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সমগ্র দেশে রাখীবন্ধনের আয়োজন করলেন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা গঙ্গার দিকে অগ্রসর হলো। স্নানের পর প্রত্যেককে তিনি রাঙা রাখী পরিয়ে দিলেন। প্রীতি ও অনুরাগের রক্তশতদল ফুটে উঠল। এই উৎসবে জনগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ রচিত "বাংলার মাটি বাংলার জল" সংগীতটি গাওয়া হল। ১৯০৫ সালের পর পঞ্চান্ন বছর কেটে গেছে, কিন্তু তবু সেই গানের প্রয়োজন শেষ হয়নি, বরং মনে হয় এর প্রয়োজন বর্তমানে আরও বেড়ে গেছে।

এর পরের দশ বছরের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতীয়তার ইতিহাস। দেশ ও কালের গণ্ডী তাঁকে রুদ্ধ করে রাখতে পারে নি। জাতীয়তাবাদ যে কিরূপ ক্ষতিকারক তাই তিনি উপলব্ধি করলেন। ১৯১৬ সালে সুদূর মার্কিন দেশে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক হওয়ার জন্য আবেদন করেন। ইউরোপ ও আমেরিকা তখন দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলির উপর নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করছিল। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন মার্কিনবাসীদের সামনে। ইউরোপের জাতীয়তবাদের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" তাঁর আন্তর্জাতিকতারই শাশ্বত প্রতীক।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সামরিক পুলিস নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেইরূপ কাহিনী বিরল। বর্বরতা কতদূর যেতে পারে তাই প্রমাণ করলে বৃটিশপদলেহী সামরিক পুলিশ। সুচতুর ইংরাজের কৌশলে দীর্ঘ তিনসপ্তাহকাল ভারতীয় কোন সংবাদপত্রে এই নৃশংসতার বিবরণ প্রকাশিত হতে পারে নি। মে মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই পাশবিকতার কাহিনী জানতে পারলেন। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। রবীন্দ্রনাথ চাইলেন সুদূর পাঞ্জাবে ছুটে গিয়ে পশুবলদৃপ্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে প্রাণপণে নিরস্ত করলেন। কিন্তু তবু তাঁর মনে শান্তি এল না। ইংরাজ সরকার তাঁকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেছিল। সেইদিন তাঁর মনে হলো সেই ভূষণ যেন তাঁর গায়ে কাঁটার মত বিঁধছে। "নাইট" উপাধি বর্জন করাই শ্রেয় মনে করলেন। ১৯১৯ সালের ৩০শে মে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি বর্জন করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট যে ঐতিহাসিক পত্র লিখেছিলেন তার কিছুটা অংশ অনুবাদ করে বলছি—

"পাঞ্জাব সরকার যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করছি যে, আমরা কত বড় অসহায়। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে ব্যাপক নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা কোনও সভ্য সরকারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হয়েছে তারা নিরস্ত্র ও অসহায়, আর যাঁরা অভিযান চালিয়েছেন তাঁরা সকল প্রকার মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত। সরকার এই ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক বা নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দেন নি।...যখন আমারই স্বদেশবাসী এরূপ জঘন্যভাবে নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েছে তখন সমস্ত ভূষণ ত্যাগ ক'রে দেশবাসীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাই।"

সমস্ত আভিজাত্যের গর্ব ও গরিমা বিসর্জন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জনগণমন-অধিনায়ক হয়ে উঠলেন। অভাব, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ভারতবাসীর জয়তিলক। আজ সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে তিনি দেশের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। "গোরা" উপন্যাসে

গোরার মুখ দিয়ে যে অগ্নিস্রাবী ঝঙ্কার শোনা গিয়েছিল তা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই বাণী। "আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান, সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজা নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পূজা করতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নি। দলের চেয়ে মানুষকে তিনি বেশী শ্রদ্ধা করেছেন। "গোরা" উপন্যাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়েছেন যে, দেশজননীকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে ধর্ম সকল দলগত মালিন্যের বহু উর্ধ্বে। "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন—ভারতবর্ষের দেবতা।" "প্রার্থনা" কবিতাতেও দলগত ক্ষুদ্রতা ও ম্লান স্পর্শের উর্ধ্বে থাকার জন্য তিনি আকুতি জানিয়েছেন—

"যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।.
... ...
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

যেখানেই কোন অন্যায় হয়েছে, যেখানেই মানুষের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে হিজলী বন্দীশালায় দু'জন রাজবন্দীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান ক'রে এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিবাদ করেন। "প্রশ্ন" কবিতায় এই প্রতিবাদ সুস্পষ্ট—

"আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

এই সময়েই বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানান। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—

" 'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়
আত্মা বিসর্জন করি আত্মাকে জানিল অক্ষয়

ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয় ?"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা শুধু দিলে কিন্তু কিছু পেলে না তাদের মূক মুখে ভাষা ফোটানোর প্রয়োজনও আছে। এই সত্যই তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল যে, সমাজে যারা সবচেয়ে কম পরে, কম খায়, সবচেয়ে যাদের পরিশ্রম, সবচেয়ে বেশী যাদের অসম্মান, তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। "রাশিয়ার চিঠি" এই বিশ্বাসেরই জলন্ত স্বাক্ষর। এই সময়কার রচনা "কালের যাত্রা" নাটিকায়ও এই সুরেরই অনুরণন। জগন্নাথের রথ অচল। ধনিক বণিক সমাজের শিরোমণিরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন রথটাকে টানবার জন্য ; কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা। তারপর এলো নূতন যুগের নূতন মানুষ—শূদ্র আর সর্বহারার দল। রথ গড়গড় করে চলল। কবি বললেন, "যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে। যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক মাথা তুলে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বাধীনতার কবি নন। তিনি বিশ্বশান্তির কবি। সাম্রাজ্যলোভী জাপান যখন চীনের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে জাপানী কবি ইয়োগ নোগুচির কাছে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শক্তিমদমত্ত ইংরাজ যখন দস্যুপায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় আফ্রিকাকে বীভৎস কাদার পিণ্ডে পরিণত করেছিল, যখন আফ্রিকার ধূলি মানুষের রক্তে আর অশ্রুতে মিশে পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল, তখন শান্তির কবি সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। "নারীঘাতী শিশুঘাতী" নিষ্ঠুর হিংসাকে কবি বারে বারে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তি নেই। তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি শোনা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা মায়ের মুখের হাসি, শিশুর প্রাণবন্যা, প্রিয়ার মধুর লীলাচাপল্য ধ্বংস করার জন্য রক্তাক্ত হাত বাড়িয়েছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমাদের বার বার মনে পড়ে শান্তির কবি রবীন্দ্রনাথকে। শান্তির স্বপক্ষে, অপমানিত মানুষের স্বপক্ষে, প্রগতির স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ। আজকে অনেক কান্না আর রক্তের বিরাট সাগর তৈরী হয়েছে। চারদিকে শুধু দিশাহারা অন্ধকার। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে বারবার মনে পড়ে—

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
তাই বিদায় নেবার আগে ভাই
সবাকারে ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথের সেই ডাক আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তখন রোগশয্যায়। বৃটিশ পার্লামেন্টের মহিলা সদস্যা কুমারী রাথবোন ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে উপহাস করে পণ্ডিত নেহেরুর উদ্দেশে এক চিঠি লেখেন। জহরলাল তখন কারান্তরালে। রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা থেকে কুমারী রাথবোনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছেন তার খানিকটা অংশ বাংলায় অনুবাদ করছি—

"ইংরেজ জাতি গত দু'শত বৎসর আমাদের দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। তাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য, তারা ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের কি উপকার করেছেন? আমি চতুর্দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন শুধু অগণ্য ক্ষুধায় খিন্ন নরকঙ্কাল দেখতে পাই। ···বৃটেনের প্রত্যেকটি অধিবাসী নিজেদের দেশরক্ষার জন্য নিপুণভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু, ভারতে একটি লাঠি রাখাও অবৈধ। একটা জাতিকে এভাবে ক্লীব করে রাখা হয়েছে···কুমারী রাথবোন কী আশা করেন যে, যেহেতু ইংরেজ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে সেই উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা চিরকাল ইংরেজের পদচুম্বন করব?"

"সভ্যতার সংকট" অন্যায়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রতিবাদ।

আজ ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সত্যিকার স্বাধীনতা কি আমরা পেয়েছি? এই প্রশ্ন লক্ষ লোকের মনে উঁকি দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু॥"

রবীন্দ্রনাথের রচনাকে তাই জীবনের নানাদিকের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁর কাছে ঋণ আমাদের, তবে তিনি আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছেন কেন—

"গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়,
হে বন্ধু, বিদায়।"

দাতা ঋণী কিংবা গ্রহীতা ঋণী এই প্রশ্ন। বিদগ্ধ সমাজের প্রতি এই কি তাঁর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন?

'কথার ফড়িং ঝাঁপায়'

হরপ্রসাদ মিত্র

কথার গুণেই রসিকের মন-কে রবীন্দ্রনাথ কথার পরপারে,—অথবা কথার গভীর তলে পৌঁছুতে সাহায্য করেছেন। আবার, এক সময়ে সেই কথাকেই তিনি বলেছেন 'কথার ফড়িং'। তাঁর এ-উক্তি একেবারে শেষ বয়সের ঘটনা। ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে তিনি লিখেছিলেন যে, প্রদোষের লগ্নে অলস মনের আকাশেতে এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক নেমে আসে। সেইসব কথার মধ্যে—'কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ'। যখন কর্মরথে ঘড়ঘড়ানি থেমে যায়,—সেই অলস মনের অবকাশে তাঁকে যেন বিশেষ এক রকম অনুভূতি এসে আচ্ছন্ন করে! এই ছিল তাঁর নিজের স্বীকৃতি। তিনি বলে গেছেন যে ঠিক তখনই—ঠিক সেই অনুভূতির লগ্নেই তাঁর কলমে 'কথার ফড়িং' এসে দেখা দেয়।

ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

তখন নানা স্তরের নানা স্মৃতি এসে একযোগে উচ্চারিত হতে চায়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্বয়ের রহস্য যে কী রকম, সেই কথাই ভাবতে বসেছিলেন কবি। ১৯৪০ সালের লেখা তাঁর এগারোটি ছড়ার সংগ্রহ 'ছড়া' বইখানির আদিতে এই যে কবিতাটি তিনি যোগ করেছিলেন, এরই শেষের কয়েক ছত্রে তাঁকে সেই ব্যাখ্যাতে উদ্যত হ'তে দেখা গেছে:

আছে ওরা এই তো জানি,
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিঁড়লে তারা

কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা ॥

এখানে বিশেষ ভাবে ছড়ার প্রাণধর্মের কথাই তাঁর মনের দৃশ্যক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করেছিল বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে ভেবে দেখলে শুধু ছড়া কেন, সকল কালের কাব্যসৃষ্টির সকল সার্থকতার কথাই তাঁর ঐ 'বাঁধনটাকেই অর্থ বলি' উক্তির মধ্য দিয়ে বলা হয়ে গেছে।

এই লেখাটির প্রায় বারো বছর আগে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বিচিত্রিতা'র 'স্যাকরা' কবিতাটি জন্মলাভ করে। তাতে শিল্পীর উদ্দেশে একটি প্রশ্ন ছিল :

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতনভরে।
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন—

শুধাই তারে প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন—

আমি বলি কিনে তো লয়
মহারাজাই
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।

এবং পরবর্তী প্রশ্ন—

আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে
স্যাকরা বলে, অলস ছোঁওয়ায়
রূপ লভে সে।

পরিশেষে এই প্রশ্নোত্তরমালার চূড়ান্ত নির্দেশটুকুও অনুচ্চারিত থাকে নি—

শুধাই, একি একলা তারি
চরণতলে।

স্যাকরা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

এই স্যাকরার কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে শিল্পসৃষ্টির গভীর কথাটি কে না অনুমান করতে চান? আর, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে-কথা যে নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক—তা কি দু'বার বলতে হয়?

'বিচিত্রিতা'র সূচনায় নন্দলাল বসুর উদ্দেশে তাঁর যে 'আশীর্বাদ' ছাপা হয়েছে, তাতে আচার্য নন্দলালের সম্বন্ধে 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী' কথাটি আছে,—আর, সে আশীর্বাদ হোলো 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ'! শিল্পসৃষ্টির কাজে মানুষের মন যখন মগ্ন থাকে, তখন সে যে তথাকথিত সাংসারিক প্রবীণতার ভার থেকে মুক্ত হয়,—সেই ইশারা এবং সেই সঙ্গে সময়োচিত কিঞ্চিৎ কৌতুক পরিবেশিত হয়েছিল এই সব সমাদরভাষণে। এবং নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে তাঁর কাব্য-সাধনার পাশাপাশি অন্য এক শিল্পে—অর্থাৎ চিত্র-সাধনায় রত হয়েছিলেন, তারও উল্লেখ আছে সেই আশীর্ভাষণের শেষ স্তবকে, যেখানে তিনি বলে গেছেন:

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

ছবির রাজ্যে যেমন মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা দেখবার সামর্থ্য দরকার, কথার রাজ্যেও তেমনি কেবল নির্দিষ্ট অর্থবাহী শব্দের অর্থসংস্কারসীমাতেই আবদ্ধ থাকা চলে না।

শেষ পর্বের নানা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলে গেছেন। 'নবজাতক', 'সানাই', 'আকাশপ্রদীপ' ইত্যাদি নানা কবিতাসংগ্রহের কথা মনে পড়ে। শুধু 'আপন অনিয়মে' 'খোলা মনের' সৃষ্টি—ছড়ার কথাই নয়;—শুধু কথার ফড়িং ঝাঁপিয়ে চলবার কাহিনী নয়;—সোনা মানিকের জাঁক-জৌলুষও নয়;—জগতে জগতে অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে

বিশ্বচরাচরের মর্মকথা যে বাণীমূর্তিতে, যে বাণীব্যঞ্জনায় কেবলই রূপ নিচ্ছে, তিনি সেই অনন্তকালের পরমবাণীর কথাই বলে গেছেন। সর্বসাধারণের পায়ে-চলা পথ ধরেই এগিয়েছিলেন তিনি। কবি হিসেবে সে-কথা তিনি বিশেষভাবে বারবার অনুভব করে গেছেন! চলতে চলতে তাঁর পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, গায়ে ধুলো লেগেছে,—তাঁর নিজের কথায়—'দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া, তারই মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া, কতই বা হারানো'—সেই বোধের পথে,—'কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো'র বিশেষ অনুভূতি-তাড়নায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে-দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা
শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি।
জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা,—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এটি তাঁর 'শেষ সপ্তক'-এর ছত্রিশ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে তুলনীয়—এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'সংযোজনী' অংশে। হাঁ, তুলনীয় দুদিক থেকেই,—ব্যাপকভাবে জীবনবোধের দিক থেকে,—এবং বিশেষভাবে কথার শিল্প-প্রযুক্তির দিক থেকেও। এই রকম গভীর উক্তি তাঁর পদ্যেও আছে,—গদ্যেও বিরল নয়। মনে পড়ে অনেকদিন আগেকার কথা। সেই সুদূর অতীতে,—'খেয়া'র পরে এবং 'নোবেল' পুরস্কার পাবার আগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরতর ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছিলেন। তখন 'কথার ফড়িং'-এর প্রসঙ্গ নয়,—অগোচরের সঙ্গে যোগসাধনের ভাবনাই প্রধান ছিল বলে অনুভব করা যায়।

১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে 'শান্তিনিকেতন'-এর অন্তর্ভুক্ত তাঁর 'গুহাহিত' রচনাটি জন্মলাভ করে। তাতে তিনি অগোচরের সঙ্গে যোগসাধনের জন্যে নিযুক্ত আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। উপনিষৎ যাকে বলেছেন 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং'—সেই অগোচরের উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন—'এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি।' এবং—'মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে —তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।'

'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'

জগৎ জুড়ে আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তাঁর খ্যাতির শঙ্খ আজ দিকে দিগন্তরে, সমুদ্রের একূলে ওকূলে। যিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অজস্রবিধ সৃষ্টির মাঝে—সাহিত্যের আসরে যিনি ধ্রুপদের চর্চা করেছেন—তাঁর পূজা আমরা করব না! তিনি ত বাঙালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু, পরম আদরের ধন। বাংলা ভাষার দৈন্যদশা ঘুচিয়ে যিনি তাকে অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী দান ক'রে জগৎসমক্ষে স্থায়ী আসন দিয়েছেন, তিনি যে বাঙালীর কি মহৎ উপকার করেছেন তা যদি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় তবে তার চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে! পাশ্চাত্যের কাছে শেক্সপীয়র যা, বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক বেশী।

এমন যে রবীন্দ্রনাথ, তুষারমৌলী হিমাচলের মত যাঁর গৌরবোজ্জ্বল উচ্চতা, তাঁকে কথার বাঁধনে কে বাঁধবে! যা সুন্দর তা মনকে স্বতঃই আকর্ষণ করে—অনাবিল আনন্দে, সুগভীর প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়। বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না, অনুভূতি দিয়ে তার রহস্য উন্মোচন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার ও বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। তাঁকে কেন ভালবাসি, এ প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক রয়েস-এর মতে বলতে ইচ্ছে করে, ভালবাসি বলেই ভালবাসি—I love because I love. 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।' সম্পাদকীয় কলমে অবাক হয়ে শুনতে চেষ্টা করছি তাঁর বহু বিচিত্র গানের দুয়েকটি সুর।

গণসাহিত্য রচনার প্রয়াস একান্তভাবে আধুনিক ঘটনা, এ-ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। চাষী মজুরকে উপজীব্য ক'রে যে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, তার স্বাক্ষর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' সুস্পষ্ট। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের অধিকারে যাদের বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছিল, তাদের পুরোভাগে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। তিনি আমাদের শুনিয়েছেন 'ভাঙার গান', বাজিয়েছেন 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী'। সমাজের উচ্চমঞ্চে আসীন হ'লেও 'পৃথিবীর কবি' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এইসব মন্ত্রবর্জিত, অন্ত্যজদের প্রতি যে না পড়েছে তা নয়। তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির স্তরে স্তরে 'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক'দের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি, গভীর মমত্ববোধের ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে। এদের মুখে ভাষা দেওয়ার অঙ্গীকার কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল প্রদীপ্ত যৌবনে (cf. 'এবার ফিরাও মোরে'); 'এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ধ্বনিয়া তুলতে চেয়েছেন কবি আজীবন নানা প্রবন্ধে, চিঠিতে, গল্পে, নাটকে। দেবতার পূজার জন্য শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা বাছা ফুল যারা তোলে,

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন দূরে ঠেকিয়ে মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে যারা অবজ্ঞা করে তাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের শাণিত কৃপাণ ঝক ঝক ক'রে উঠেছ বার বার। 'অপমানিত' কবিতায় দরিদ্র-দরদী কবির অগ্নিগর্ভ বাণী তার পরিচয় দেয়। উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন—মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার ক'রে তাকে মনুষ্যত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত ক'রে ঈশ্বর উপাসনা অসম্ভব। তাঁর ঈশ্বরোপাসনার মূল উৎস মানুষ। তাই ত 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' সমস্ত ফেলে রেখে রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্ধদ্বারের দেবালয়ের' অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছেন দেবতাকে পেতে 'যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষ চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস', যেখানে 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে ওরা কাজ করে।' ধূলায় ধূসরিত দীনদুঃখীর মধ্যেও যে নররূপী নারায়ণ মূর্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেই বলেছেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

(গীতাঞ্জলি : ১০৭ সংখ্যক)

'শুচি' কবিতার মধ্যেও এই একই সুর। গুরু রামানন্দ শুচি হলেন তখনই যখন সমাজে যাদের ছোটলোক বলে সেই অন্ত্যজশ্রেণীর চণ্ডাল নাভাকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন, জোলা কবীরের গলা জড়িয়ে ধরে বসলেন তার পাশে। এতদিন রামানন্দ তাঁর ঠাকুরকে যেখানে হারিয়েছিলেন, আজ তাঁকে সেখানে পেলেন খুঁজে। এই রবীন্দ্রনাথই জন্মত ভর্তৃহীনা জবালার পুত্র সত্যকামকে 'ব্রাহ্মণ' স্বীকৃতি দিয়েছেন; রাজৈশ্বর্যমদগর্বিতা বিলাসিনী রানী (cf. 'সামান্য ক্ষতি') তাঁর সহানুভূতি লাভ করতে পারে নি; অজাত-শত্রুর প্রহরীর হাতে জীবন বিসর্জন দিয়েও বুদ্ধের পূজার অনির্বাণ দীপশিখা যে জালিয়ে গেল, সে একজন সামান্য দাসী—শ্রীমতি (cf. 'পূজারিনী'); 'নগরলক্ষ্মী'তে দুর্ভিক্ষকাতর জনসাধারণের দুঃখলাঘব করবার ভার গ্রহণ করতে পেরেছে একজন নগণ্য ভিক্ষুণী, অধম সুপ্রিয়া। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এই অনুন্নত জনসাধারণই লাভ করেছে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। 'মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি', বালক তিনু, ছেলেটা, সহযাত্রী, হিরণ মাসির মা-মরা বোনপো, 'ক্যামেলিয়া'র সাঁওতাল মেয়ে, শালিখটা, সাধারণ মেয়ে, আধবুড়ো একজন হিন্দুস্থানী, 'কিনু গোয়ালার গলি'র সেই বাঁশিওয়ালা, মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি, 'ফাঁকি'র ঝুমরু কুলির বৌ—সকলেই কবির রসদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। বলা চলে, "শুভ্র পরিণত বার্ধক্যের মৃত্যুধৃত জীবনের স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির মধ্যে শেষ কয়েকটি মাসে কবি যে চারিটি কাব্য রচনা করিয়াছেন সমস্ত মানব সংসার সেই কাব্যের আশ্রয়।" 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ'

থেকে বিদায় নিয়ে মধুময় পৃথিবীর মধুময় ধূলিকণাকে পর্যন্ত অন্তরে স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাচ্ঞা করেছেন—'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।'

স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা কখনো সংকীর্ণ জাতীয়তায় পর্যবসিত হয় নি। জীবের মধ্যে যিনি শিব খোঁজেন তাঁর কাছে আপনই বা কে, পরই বা কোথায়! 'মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়িয়ে তিনিই কেবল জাতিধর্মনির্বিশেষে নরদেবতার বন্দনা করতে পারেন—আর্য-অনার্য, দ্রাবিড়-চীন, শক-হুন, পাঠান-মোগল সব এক দেহে এসে লীন হয়েছে যেখানে। এই সর্বমানবিক অনুভবের ক্ষেত্র থেকেই-না তিনি সবার পরশে মাতৃমঙ্গলঘট পবিত্র করার কথা ভাবতে পারেন। বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় ভূমিই ত তখন তাঁর কাছে স্বর্গভূমি। যিনি নিজের অন্তর্যামী পরমপুরুষকে জানতে পেরেছেন, তাঁর তো ঘর-পর ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তখন সব ঠাঁই তাঁর ঘর, ঘরে ঘরে পরমাত্মীয়। তাঁর কি তখন কোনো জাত থাকতে পারে? তিনিই ত কেবল উপলব্ধি করতে পারেন—'জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষজাতি।' তাঁকে তখন বলতে শুনি—

"কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

পূজারি···প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?"
আমি বলি "না।"

*

দলের উপেক্ষিত আমি
মানুষের মিলনক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

*

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে,
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।" (পত্রপুট : ১৫ সংখ্যক)

শেষজীবনে এই "সর্বমানবিক চেতনাই প্রবল হয়ে উঠে তাঁর গানকে করে তুলেছে সকল মানুষের গান এবং ক্রমে তা আরো বাস্তব-ঘেঁষা হ'য়ে হাটবাটের দীনদরিদ্র সাধারণের অভিমুখী হয়ে পড়েছে; এমন কি তাদের জীবনে জীবন মিলিয়ে তাদের গান গাইতে কবি ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।"

রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে ঔপনিষদিক মোহের বিস্তার নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু তাই বলে লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তাঁর কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তাঁকে গণসাহিত্যের অগ্রদূত আখ্যা দিলে অত্যুক্তি করা হবে কি?

কবি রবীন্দ্রনাথের আরেক পরিচয় একজন যথার্থ দার্শনিক হিসেবে। কবিতা নিঃসন্দেহে ভাবের অভিব্যক্তি। আত্মলীন ভাবকল্পনার মায়ামাধুরীর জগতের প্রতি কবিদের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যত রোম্যান্টিক, রসাবেশে বিহ্বল, সুন্দরের উপাসনায় বিভোর। প্রতীচ্যের কবি কীট্‌স্ তাই ত বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণের ফলে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটাও তার মাধুর্য হারাবে। কাব্য ও দর্শন এক বস্তু নয়, একথ অবশ্যস্বীকার্য। একের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাধান্য, অপরটিতে সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারার বিস্তার। কিন্তু তাই বলে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্কও যে খুব নিবিড় তা অস্বীকার করা যায় না। 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।'

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে বিশ্বাসী কবি কিন্তু কখনো বৈচিত্র্যময় বহুকে অস্বীকার করেন নি। তবে এই বহুর মধ্যে তিনি এককে দেখেছেন, বিচিত্রের মধ্যে এককে পেয়েছেন। কখনো বা সীমার মাঝে অসীমের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন; আবার কখনো বা উপলব্ধি করেছেন—'অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ।' বস্তুত এই সীমাও অসীমকে এক নিবিড় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সাধনা। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে—রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী, না, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী?—তার উত্তর। সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার মধ্যে একটা তত্ত্বকথা নিহিত রয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, তত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে কবিতা রচিত হলেও, তত্ত্ব কিন্তু কবিতার ভার হয়ে দেখা দেয় নি, বরং কণ্ঠহার হ'য়ে শোভা বর্ধন করেছে। তত্ত্বটি ছন্দের নিগড়ে এমনভাবে বাঁধা পড়েছে যে, কবিতার সরসতা ও মাধুর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা।

রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানুষের জয়ঘোষণায়। শঙ্করাচার্যের মত তিনি দৃষ্ট বস্তুপুঞ্জকে মায়াময় অজ্ঞানতা বলে অস্বীকার করেন নি। জীবের মধ্যেই যখন শিবের অধিবাস, তখন জীব কি কখনো মিথ্যে হতে পারে? অন্তরমাঝে তিনি অহরহ বসে মুখের

ভাষা কেড়ে নিচ্ছেন। তাই আমরা যা বলি তা তো তিনিই বলান। শুধু কি তাই? মানুষ আছে বলেই না ভগবানের অস্তিত্ব? 'আমি এলেম তাই তো তুমি এলে।' মানুষকে দেখবার জন্যই তো সেই পরমপুরুষের অসীম কৌতূহল; 'নইলে যে এই সূর্য তারা সকলই নিষ্ফল।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন 'মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে করে দেব-মহিমা নির্ভর।' তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলেন—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।" (আমি : শ্যামলী)

যা' সত্য তা' তত্ত্বকথা বলে কি কাব্য হতে পারবে না! এই সত্য তত্ত্বকথাকে আশ্রয় করে কবিতা কল্পনালতার জাল বুনেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই দুর্লভ প্রজ্ঞাবোধ তাঁকে মৃত্যুর অন্তরে বসে অমৃত অন্বেষণে নিযুক্ত করেছে, দুঃখের সাথে যুঝে সুখের আস্বাদন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। মৃত্যুকে পরম সুহৃৎরূপে দেখতে পেয়েছেন—পুরোনো, জীর্ণ, ক্লান্ত, অচলকে পিছনে রেখে যে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে রাখালের মত নব নব চারণক্ষেত্রে। মৃত্যু তাঁর কাছে 'শ্যাম-সমান'। কোন দুঃখই তো তাঁর কাছে দুঃখ নয়; কেননা 'দুখের বেশে' ভগবান তো আমাদের কাছে ধরা দেন। তাই 'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।'

প্রশ্ন জাগতে পারে, রবীন্দ্র-দর্শনের অনুপ্রেরণাস্থল কি? এক কথায় বলা যেতে পারে—প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি কবির গভীর আসক্তি-লব্ধ সুদূরপ্রসারী অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গী। সুধী সম্প্রদায় ডঃ সরোজকুমার দাসের 'Philosophic Legacy of Rabindranath Tagore' প্রবন্ধটি থেকে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন।

দার্শনিক ও কবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর উপন্যাস ও নাটক রচনাতেও ধরা পড়েছে। প্রথাবদ্ধ রীতির অনুশাসন মেনে চলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কাব্যের ছন্দ নিয়ে

তিনি যেমন দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন, উপন্যাস ও নাটকের মধ্য দিয়েও তেমনি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্র-উপন্যাস ও নাটকের যোগ্য অনুসরণ হয় নি, হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা তাঁর সুদুর্লভ প্রতিভা অনন্যসাধারণ যেমন অননুকরণীয়ও তেমনি। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষের প্রবন্ধ দুটি এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমাদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি যে শুধু বই লিখে গেছেন তা নয়, বিজ্ঞান নিয়ে দিক্‌পাল বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করবার স্পর্ধাও রাখতেন তিনি। ডঃ ডি. এম. বোসের 'Some Contacts with Rabindranath' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিজ্ঞানকে উন্নত করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। জগদীশচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, বাঙালী বিজ্ঞানসাধকের সাধনালব্ধ ফলকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি অপরের কাছে হাত পাততে পর্য্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ'-এ এ উক্তির সত্যতা যাচাই করুন।

বিপুল কিরণে যে রবীন্দ্রনাথ ভুবন আলোকিত করেছেন, তিনি কিন্তু কখনো স্কুল-কলেজের প্রাচীর-ঘেরা অচলায়তনের মধ্যে ভালো ছেলে সেজে লেখাপড়া করেন নি। যেখানে চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ কোথায়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কখনো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি। (cf. 'আমি বরাবরই ব'লে এসেছি শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সংগে মিলিয়ে চালানো উচিত।') কেননা 'শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই' যে শিক্ষার লক্ষ্য। 'Education is preparation for complete living.' রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় পাস করলেই যথার্থ শিক্ষিত হওয়া যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বিকাশসাধন নয়, আত্মিক শক্তির বিকাশসাধনও বটে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এর অভাব অত্যন্ত প্রকট। কবি তাই দুঃখ ক'রে বলেছেন—'ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন।' আর 'সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই, সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে।' পুঁথিকে আমরা কত বড়ই-না মনে করি এবং পুঁথি যার প্রতিবিম্ব তাকে কত তুচ্ছ বলেই-না জানি। তাই আজ আমরা 'মনকে পুঁথির রাজা' না ক'রে 'পুঁথিকে মনের রাজা' করতে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই—'পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।' রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন 'আমাদের ঘর

আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।' শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে তপোবনের পরিবেশকে তিনি বিশেষ উপযোগী ও অনুকূল বলে মনে করতেন। প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে, তার সাথে নিবিড় একাত্মতা স্থাপন ক'রে। তিনি বলেছেন—'মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা ক'রে মরবে।' তাই ত ব্যাকুলকণ্ঠে তাঁকে বলতে শুনি—'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।' গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ তাই তাঁর মন ভুলিয়েছিল। মানুষকে যথার্থ মানুষ ক'রে তোলবার জন্যই বোলপুরের উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গনে তিনি তাঁর বড় সাধের শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এই শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা ও শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচয় লাভ করতে আসুন আমরা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর সাথে 'শান্তিনিকেতন' পরিক্রমা করে আসি।

সবার উপরে কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ। তিনি নাছোড়বান্দা অটোগ্রাফ-শিকারীকে কেবল একপাতা কবিতা লিখে দিয়েই নিশ্চেষ্ট হন না, তাকে প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে, তার সাথে গল্প করে তবেই তাঁর তৃপ্তি। (cf. 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ'—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। এ সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি নিজের মেয়ের বিয়েত বন্ধুবান্ধবদের অনুপস্থিতিতে আর পাঁচজন মানুষের মতই নিরানন্দ বোধ করেন। (cf. জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।) এ রবীন্দ্রনাথ হলেন মানুষ ; মস্ত বড় মানুষ, তবু মানুষ। আসুন, আপনারা গল্প-বলিয়ে চারুচন্দ্র দত্তের কাছে বসে পড়ুন। মানুষ রবীন্দ্রনাথের গল্প বলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের মনোহরণ করতে সক্ষম হবেন।

আমাদের রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসব

॥ রবীন্দ্রপরিষদের কর্মসূচী ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিষদ্‌কে আজ চেনেন অনেকেই। আজ থেকে তিনদশক আগে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র ক'রে এর পত্তন। সেদিনের পর কবির জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে এই পরিষদ্ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। এই পরিষদের আলোচনাসভায়, নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন এবং রসগ্রহণ করেছেন সেদিন। পরিষদের সেই জন্মগৌরবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে কবির জন্মশতবর্ষে তাঁর চিন্তাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদের পবিত্র কর্তব্য মনে করেছি। তাই এ বছর রবীন্দ্রপরিষদ্‌কে প্রথানুক্রমিক মনীষী-তর্পণ, সাহিত্য ও সঙ্গীত-সভা ছাড়াও দুই পর্যায়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান গত ২৪ থেকে ২৭এ এপ্রিল কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারে সম্পন্ন হয়েছে, তার বিবরণ দেওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের এই কর্তব্যে সস্নেহ উপদেশ ও অকুণ্ঠ সাহায্য করে আসছেন।

২৪-এ এপ্রিল :—রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। 'রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র' বিষয়ে আলোচনা করেন আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক, কবির স্নেহভাজন প্রবীণ সাহিত্য ও বিজ্ঞানসেবক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পরিষদের সভাপতি ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন এবং শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ (আমাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ভাষণ দেন। ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন।

২৫-এ এপ্রিল :—'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন' ও 'রবীন্দ্রনাট্যের প্রয়োগবিধি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি। ছাত্রছাত্রীদের গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

২৬-এ এপ্রিল :—ডক্টর সুকুমার সেন (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক) এবং ডক্টর কালিদাস নাগ যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও বহির্বিশ্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীপ্রসাদ সেন, শ্রীমতী সুমিত্রা সেন ও অন্যান্য শিল্পীরা।

২৭-এ এপ্রিল :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের ডীন, রবীন্দ্র-পুরস্কারজয়ী লেখক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের ঐতিহ্য' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস।

এই সময়ে আর্টস লাইব্রেরিতে কবির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিটি পুষ্পসজ্জিত রাখা হয়।

৭ই আগষ্ট :—সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাল' পর্যায়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

আমাদের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানসূচী সেপ্টেম্বর মাসে উপস্থাপিত করবার পরিকল্পনা আছে। ধারাবাহিক আলোচনা, কবি সম্মেলন, ঔপন্যাসিক সম্মেলন, সংগীতানুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের কবিতা ও প্রবন্ধকে অনুপ্রেরণা দান ইত্যাদি নানা ধরনের কাজের মধ্যে আমরা কবিকে অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা করেছি। জানি না আমাদের স্বপ্ন কতদূর সফল হবে। তবে ছাত্রছাত্রীবন্ধুদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি যে, কেবলমাত্র সংগীতানুষ্ঠান বা নাট্যানুষ্ঠান করেই রবীন্দ্রনাথকে জানা যায় না। কবির জীবনদর্শন, তাঁর শিক্ষাদর্শ, তাঁর পরিশীলিত সৌন্দর্যরুচি, তাঁর মানবপ্রেম, তাঁর নির্ভয় পৌরুষ—এই সব নিয়ে যে ব্যাপ্তি, তারই আকর্ষণে আমরা জেগে উঠতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হোক তাঁর ধ্যানকে সত্যরূপদান, তাঁর গানকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি, তাঁর প্রেরণায় মানব-সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা।

শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, রবীন্দ্রপরিষদ্ ও
রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি।

THE
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

VOL. 43 SEPTEMBER, 1961

Prantik : Poem No. 14

RABINDRANATH TAGORE

It's time for the bird to go.
Presently the nest will be empty.
The hushed song, the crumbling nest, will be shaken
by the forest to dust.
With the withered leaf and the faded flower I too
shall be wafted at break of day into the trackless void
beyond the sunset sea.
Long have I enjoyed the hospitality of this earth:
Sometimes I have received her invitation laden with the scent of
mango-blossoms and sweet with the suavity of Phālgun:
The aśoka *sprigs have hinted their desire for my song, which I have*
given full of love:
Sometimes the blasts of Vaisākh *have choked my throat with*
scorching dust and disabled my wings:
With all these I have been blessed with the honour of living.
When the weary journey on this shore has ended, I shall turn back
for a moment in humble homage to the Genius that
presides over this life.

—*tr.* T. N. S.

The Philosophic Legacy of Rabindranath Tagore

DR. SAROJ KUMAR DAS

It is in the fitness of things to refresh our memory of what Dr. S. Radhakrishnan placed on record,[1] more than four decades ago, in appraisement of Tagore's literary contributions to India and the world at large. "In interpreting the philosophy and message," so he wrote in that context, "of (Dr.) Rabindranath Tagore, we are interpreting the Indian ideal of philosophy, religion, and art, of which his work is the outcome and expression. We do not know whether it is Rabindranath's own heart or the heart of India that is beating here. In his work India finds the lost word she was seeking". Attuned hereto is the testimony of another kindred soul, the poet-seer, Sri Aurobindo, who characterised Tagore's work as a "chant-filled realm in which the subtle sounds and lights of the truth of the spirit give new meanings to the finer subtleties of life", and thus serving to "create a new and deeper manner of seeing life, to build bridges of visioned light and rhythm between the infinite and eternal and the mind and soul and life of man". Such a sense of life must, and does in fact, "reveal itself to the greatening mind of humanity now that mind is growing in world-knowledge and towards self-knowledge."[2]

Instructive and informative as these appraisements are, they are not to be regarded as typical of the reception accorded to Tagore as a poet-philosopher and teacher. It passes almost for a truism that to be great is to be misunderstood; and Tagore has not escaped the traditional penalty of greatness. But it is a strange dispensation of Providence that great men are more honoured by divergence than by obedience. It is a happy augury that there has been of late a turn in the tide of age-long misunderstanding and misrepresentation, sometimes wilful, more often foolish and fitful. Any way to the ends of a correct assessment of his greatness as a thinker, if not as a teacher as well, what is of fundamental importance is the proper appreciation of the spiritual background and mental climate of his parental home and his ancient homeland. This mental climate was further precipitated by the currents of three movements: "the religious, introduced by Raja Rammohan Roy; the second, literary in character, inaugurated by Sri Bankim Chandra Chatterji; and the third, started contemporaneously, and called National".[3] By virtue of the inherited genius for what Dr. S.

[1] Preface to *The Philosophy of Rabindranath Tagore.*
[2] *Golden Book of Tagore,* p. 92.
[3] Tagore, *The Religion of an Artist,* pp. 1-2.

Radhakrishnan has happily termed "the constructive conservatism of Indian thought", Tagore turned to best accounts the three-fold revolutionary movement, without cutting himself adrift from the traditional moorings of thought and culture, of Upanishadic thought in particular. It is known, far and wide, from the testimony of the poet himself that the earliest inspiration of his spiritual life—in all its lineaments, ethical, æsthetic and religious or devotional—was derived from the texts of the Upanishads in the context, and with the commentary,[4] of the saintly life of his father, Maharshi Devendranath Tagore. While Raja Rammohan Roy preached and propagated the religion of the Upanishads to the world at large, Maharshi Devendranath Tagore exemplified, for the first time in recent history, the religion of the Upanishads in his own life, with a singleness of devotion. But, as the late Dean of St. Paul's would say, religion cannot be taught, it is always caught; and providentially enough, the building poet-seer Tagore had caught this contagion early in life. The seminal influence thus implanted in the seed-plot of a poetic genius did fully fructify in the way in which it was destined to do, serving both as the law and impulse of its prolific creations.

Leaving the doctors and the doctrinaires to dispute and differ among themselves, we should be well advised to accept *in toto* the poet's own *apologia,* framed on the basis of what Edward Caird, the reputed British neo-Hegelian writer, formulated as the law and order of all mental development on the part of creative minds. As early as in March 1893, a letter[5] written from *Teran* reveals that during his itinerary in the romantic surroundings of Puri and Khandagiri, he had in his book-case, "not *Meghadûta* but Caird's *philosophical essays*[6] instead." Now, to a book on "Bengali Writers" ("Bangabhāshār Lekhak" published 14th Sept. 1904, B.S. 1311), Rabindranath had contributed an article, delineating the order and stages of development of what he considered to be the *élan vital,* the vital impulse, of his poetic career and creations. His expressions, transparently sincere as they were, still appear to be the *magna carta* of all creative poesy, although they were adjudged by contemporary critics, notably by the late Dwijendralal Roy, to be smacking of "vanity and egotism". As called upon by the editor of *Banga-darshan,* all that the poet pleaded in self-defence is that "the Idea about which we were first unconscious, impels us to speak and do as we did all through and even the words and actions of our immature state are unconsciously induced by the power of that Idea—it is this realisation of the idea that I endeavoured to express in my short autobiographical account in a rather halting manner." The defence was further

[4] Vide Tagore's *Preface* to the *Sādhanā.*

[5] Reproduced in *Chhinnapatra,* p. 128.

[6] Probably E. Caird's *Essays in Literature and Philosophy* is meant here.

fortified by a relevant quotation from Caird's writings[7] which runs to this effect: "Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows;* and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development; but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are."

Confessedly, all his writings and discourses—notably from the "Awakening of the Waterfall' (*nirjharer swapnabhanga*) right upto the last poem composed by him just a week before his demise—have proved to be a long-drawn attestation of the power of the Idea acknowledged by him. From a slightly different angle of vision but in doctrinal sympathy herewith, Ernest Rhys, to whom the poet had dedicated his *Sãdhanã*, recorded[8] his enlightened testimony that "in Tagore you feel the humanity that was in the son of Man, comforting the children of light in their awe of the Eternal. In him the spirits of the Upanishads reach the same threshold. It was natural that out of a living belief in the beauty of the earth, in sun and stars, and in the waters below, there should grow a living faith such as Rabindranath Tagore has expounded in the *Sãdhanã*. The test of its truth for him is that by living by it, and dowered by Nature to enjoy life to the full, he has found the medicine to heal the troubles of his own day." The felicitous expression of the 'test of truth' in 'living by it' makes its ready appeal to the Eastern mind; but, strictly speaking, in the Republic of Letters, there is no point in the distinction we so often make between the East and the West; for, Truth, after all, has no geography of its own. As a case in point, reference may be made to a kindred soul, the late Dr. L. P. Jacks (of 'Hibbert Journal' Editorship fame) who has to his credit a much-prized gift of philosophic discernment that the end of all wisdom envisaged by philosophy is 'not to know, nor to think, nor even to mean Reality but *to live our way into Reality*'.

When all is said and done, the fact remains that it is unflinching loyalty to the 'power of the Idea' in Tagore, which has invested all his expressions with an authority and dignity all their own. It has served to exalt his knowledge into vision, his thought matured to inspiration. It is, for aught we know, a species of thinking which has a family resemblance with what Hegel, the champion of high-level philosophical thinking, gave utterance to on a famous occasion—"Thinking is also Divine Service" (*Denken ist auch Gottesdienst*); as also with what Bradley, the neo-Hegelian British thinker, sought to suggest by characterising metaphysical thinking "as a principal way of experiencing the Deity". On such heights alone

[7] Presumably from the book referred to under f.n. (6).
[8] *Golden Book of Tagore*, p. 212.

can Poetry and Philosophy come together to celebrate "the wedding of the intellect to this goodly universe in love and holy passion", with the high-priest of Imagination, officiating as "Reason in its most exalted mood", in tune with the liturgy of poetry as "the breath and finer spirit of all knowledge".

Along this line of approach, we are persuaded to believe with the Irish poet (the introducer of *Gitānjalí* to the Western World) that "whatever of philosophy has been made permanent is alone poetry." As a matter of fact, a philosophic doctrine, worth the name, must be the outcome of a 'vision' or a synoptic view of the world as a whole; for a philosophy is nothing but a persistent effort "to see life steadily and see it 'whole' ". It is the 'vision', the whole view of things (as William James, the pragmatist philosopher of America has said) that counts with every philosopher, be he a pluralist or a monist, an empiricist or a rationalist. However paradoxical it may sound, in the face of Plato's banishment of the poets from the Ideal Republic, it is nonetheless true that Plato was primarily and temperamentally a poet, but a philosopher by profession and practice. When, therefore, he was ordaining the exile of the poets from the Ideal Republic, he did not know—such was the irony of the situation—that he was signing the warrant of his own extradition from the Ideal State. Truly, it was Plato the poet that conceived or had the vision of a world of Ideas or archetypes: it is Plato, the philosopher that strove to justify the vision with reference to the things of sensible experience. That is exactly the reason why the Platonic vision of a world of Ideas has come to be reckoned as a classical inheritance for the whole of mankind, while his teachings about 'fixed stars' or 'future retribution' have become matters of antiquarian research. Suffice it to round off the discussion with Dr. Radhakrishnan's concluding reflection in reference to the 'Philosophy of Rabindranath Tagore' that "a true poet is nothing if he is not a philosopher. A true poet will be a philosopher and a true philosopher a poet." All the same it is true that "if Rabindranath has touched Indian hearts, it is because he is first and foremost a poet and not a philosopher".[9]

In keeping with this line of thought appeared the obituary notice from the pen of the Editor of Modern Review (who happened to be the Editor also of the *Golden Book of Tagore*), in words that deserve quotation here: "In philosophy he is not a system-builder. He has been acclaimed as a Vedantist. He is of the line of our ancient religio-philosophical teachers whose religion and philosophy are fused components of one whole. His position as a philosophical thinker was recognised by his selection to preside and deliver the presidential address at the First Indian Philosophical Congress in 1925 and also when he was asked to deliver the Hibbert Lectures

[9] The *Philosophy of Rabindranath Tagore*, Chap. III, Sec. 8.

which appeared subsequently as the *Religion of Man"*. Having had a first-hand experience of what transpired behind the screen in the matter of 'selection' of the poet for the Presidentship in question, I should like to reproduce a brief account here.[10] For this purpose, I had the privilege of conducting Prof. S. Radhakrishnan (then) George V Professor of Philosophy in Calcutta University and the Chairman of the Working Committee for the inaugural session of the Philosophical Congress to the poet's residence at *Jorāsānko*. On the procurement of the poet's assent to this offer of Presidentship, Prof. Radhakrishnan utilised the occasion for a heart-to-heart talk on the course of Indian Philosophical thought down the corridor of time. The trend of the dialogue (which, for obvious reasons, cannot be reproduced here in full but should be followed up closely from the article just referred to), came in for confirmation in the historic address by Dr. Tagore on the "Philosophy of our People". from which a relevant portion is quoted herein below:

"Plato as a philosopher decreed the banishment of poets from his Ideal Republic. But, in India, philosophy ever sought alliance with poetry, because its mission was to occupy the people's life and not merely the learned seclusion of scholarship," and on intimate contact with people at large, we do "realise how philosophy has permeated the life of the people in India, how it has sunk deep into the sub-conscious mind of the country." This line of argument recalls its parallel, employed by Max Müller in his characterisation of Vedānta as the native philosophy of India, and backed by the statement "that, with the Hindus, the fundamental ideas of the Vedānta have pervaded the whole of their literature, have leavened the whole of their language and form to the present day the common property of the people at large".[11] As a matter of fact, the literature of a people is just the medium for the democratisation of the aristocratic achievements of its representative men. And in the selection of the word 'people' in this context, Rabindranath may have been drawn by an elective affinity towards Browning's usage of the term in *Luria*:

> "A people is but the attempt of many
> To rise to the completer life of one."

Whatever the construction we now put upon it, there is no denying the fact that the pledge of the title 'Philosophy of our People' stood fully redeemed—with a fulness of meaning and wealth of soulful utterances and songs that could have emanated only from a poet-seer of Tagore's eminence. Although the address is superb in conception and superb in diction, it is too apt to fall flat on academic philosophy-mongers who always go sniffing

[10] Reproduced from the present writer's article "Rabindranath and 'the Philosophy of our People'" in *Modern Review*, Jan. 1942.
[11] *The Six Systems of Indian Philosophy*, p. 151.

for 'systems', homegrown or imported, in a performance of this kind. If, as Whitehead puts it, all systems must be regarded as transitory, true intuitions serving as a treasure for ever, Tagore's address on 'the Philosophy of our People' has unquestionably achieved the high-water mark in the artistry of truth.

The address naturally gravitates towards the "idea of *mukti* based upon metaphysics which has affected our life in India, touched the springs of our emotions, and supplications for it soar heavenward on the wings of poesy." It behoves us to know "that there is no external means of taking freedom by the throat. It is the inward process of losing ourselves that leads us to it. Bondage in all its forms has its stronghold in the inner self and not in the outside world; it is in the dimming of our consciousness, in the narrowing of our perspective, in the wrong valuation of things." As in the material world, even so in the social or political field, the lack of freedom is based upon the spirit of alienation, on the imperfect realisation of *Advaitam*. There our bondage is in the tortured link of union. Nevertheless, we should know "that, though it may sound paradoxical, it is true that in the human world only a perfect arrangement of interdependence gives rise to freedom," and in this wise the "history of the growth of freedom is the history of the perfection of human relationship." The poet-philosopher proceeds, then, to close finally with a *Baül* song, over a century old, in which the poet sings of the eternal bond of Union between the infinite and the finite soul, from which there can be no *mukti,* because it is an interrelation which makes truth complete, because love is ultimate, because absolute independence is the blankness of utter sterility. The song runs thus:

'It goes on blossoming for ages, the soul-lotus, in which I am bound as well as thou, without escape. There is no end to the opening of its petals, and the honey in it has so much sweetness that thou, like an enchanted bee, can never desert it, and therefore thou art bound, and I am, and *mukti* is nowhere.'[12]

In the context of his idea of *mukti* or Spiritual Freedom is best understood Tagore's idea of creation which, in ultimate analysis, means "the World of Personality". In the characteristic language of the master-musician that he is, the poet inculcates the basic truth in this regard thus:— "The infinite and the finite are one as song and singing are one. The singing is incomplete; by a continuous process of death, it gives up the song which is complete. The absolute infinite is like a music which is devoid of all definite tunes and therefore meaningless."[13] "What I mean by personality", says Tagore, "is a self-conscious principle of transcendental

[12] Reproduced with editions from the publication of the address in the Silver Jubilee Session of the Proceedings of the Indian Philosophical Congress, 1950.

[13] *Personality,* p. 57.

unity within man which comprehends all the details of facts that are individually his in knowledge and feeling, wish and will and work. In its negative aspect it is limited to the individual separateness, while in its positive aspect it ever extends itself in the infinite through the increase of its knowledge, love and activities".[14] Thus is it that we can make truth ours by actively modulating its inter-relations. This is the work of art; for reality is not based in the substance of things but in the principle of relationship. "Truth is the infinite pursued by metaphysics; fact is the infinite pursued by science while reality is the definition of the infinite which relates truth to the person. Reality is human; it is what we are conscious of, by which we are affected, that which we express."[15] Nevertheless "the relational world of ours is not arbitrary. It is individual, yet it is universal. My world is mine, its element is my mind, yet it is not wholly unlike your world, Therefore it is not in my own individual personality that this reality is contained, but in an infinite personality."[16] It is readily perceived, then, that "the realization of our soul has its moral and its spiritual side. The moral side represents training of unselfishness, control of desire; the spiritual side represents sympathy and love."[17] Thus the whole cluster of the major problems of Philosophy find their answer, fair and square, from the poet-philosopher—in metaphysics, the World of Personality; in morals, the Ethics of Personality; in religion, an 'æsthetic theism', to use the significant expression coined by Dr. Hjarne, the erstwhile President of the Nobel Peace Prize Committee—following, perhaps, the drift of the poet's characteristic usage of the æsthetico-teleological concept of *Līlā,* centred in *Brahman* as *Ânanda.*

An expository account of the central theme of Creation has been furnished by the poet in his *Broken Ties*: "If I keep going in the same direction along which He comes to me, then I shall be going further and further away from Him. If I proceed in the opposite direction, then only can we meet. He loves form, so He is continually descending towards form. We cannot live by form alone, so we must ascend towards His formlessness. He is free, so His play is within bonds. We are bound, so we find our joy in freedom. All our sorrow is because we cannot understand this. He who sings, proceeds from his joy to the tune; he who hears, from the tune to joy. One comes from freedom into bondage, the other goes from bondage into freedom; only thus can they have their communion. He sings and we hear. He ties the bonds as He sings to us. We untie them as we listen to Him."

Reference is to be made finally to the finishing touch the poet has

---

[14] *The Religion of Man,* p. 119.
[15] *Op. cit.,* p. 134.
[16] *Personality,* p. 58.
[17] *Op. cit.,* p. 68.

imparted to the theme of Creation in its ever-recurring rhythm of music. For him " it is almost a truism to say that the world is what we perceive it to be ... the world, while I am perceiving it is being incessantly created for myself in time and space."[18] As a counterpoise to the cheap and easy suggestion of an unphilosophical Egotism, concealed herein, reference is to be made to the much-needed corrective, offered by the poet himself in the comparatively late poem "Ego" (*Âmi*),[19] where we are treated to a fine explanation in the finality of its persuasive appeal:

> "Admittedly, this is my Egoism:
> But an 'ism' of the Ego for the Universal in Man
> Verily, on the screen of Man's egoism
> Is fashioned the all-out harmony of colours and notes
> by the World-Creating Superman."

What is needed here is the redemptive grace of the poet's vision to see right across—

> "Man, proud man, drest in a little brief authority—
> Most ignorant of what he's most assured,
> His glassy essence"[20]—

the "Supreme Person" whom to know has been the "One cry of the personal man".[21] Truly speaking, the "Great Master plays; the breath is his own, but the instrument is our mind through which he brings out his songs of creation, and therefore I know that I am not a mere stranger resting in the wayside inn of this earth on my voyage of existence, but I live in a world whose life is bound up with mine"[22] to that world which is only the trysting-place for the love-lorn soul of mine. With his characteristic sweet reasonableness, he calls the world-music, the music of a 'counter-creation' (*pratisrishti*), which bursts forth in mellifluous notes—

> "What divine drink would'st thou have, my God, from this overflowing cup of my life?
> My poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes and to stand at the portals of my ears silently to listen to thine own eternal harmony?"
> "Thy world is weaving words in my mind and thy joy is adding music to them. Thou givest thyself to me in love and then feelest thine own entire sweetness in me."[23]

---

[18] Personality, p. 47.
[19] Dated, *Santiniketan,* 15th Jyaistha, 1343 B.S.
[20] Shakespeare.
[21] *Personality,* p. 69.
[22] *Op. cit.,* p. 74.
[23] *Gitanjali,* No. 65 (p. 61).

In sober prose, Creation is, assuredly, no more and no less!

On this high-pitched key, we close with the fervent desire of the poet for a 'Return once more' (*punarāvartan*) to that very world which in fact and in truth is interwoven with fibres of his heart and soul:

"Âbār jadi ichhā kara ābār āshi phirey!"

[If you will me to return, surely return I will]

Tajmahal

Rabindranath Tagore's poem done into English prose

SOMENATH MAITRA

O Emperor Shah Jahan, you knew that life and youth, and wealth and fame drift away in the current of Time; and it was your ceaseless endeavour that only the sorrow of your heart should be enshrined for eternity. Let kingly power, thunder-hard, be absorbed if it will into the Eternal Slumber as the purple colours of sunset fade away into the darkness of night; but let this one sigh from the depths of the heart rise up for ever and make the sky above it tender with regret—this was the longing of your soul. Let the pomp of diamonds and pearls and rubies be lost if it will, as the play of colours of the magic rainbow suddenly vanishes and leaves the sky bare; but let this one tear-drop on the cheek of Time, spotlessly bright, this Tajmahal, remain for ever.

Alas, O human heart, thou hast no time to look back again and again on anyone here, ah me, no time at all. Life's swift-flowing stream carries thee from one landing-place to another in the World; the burden in thine arbours at the South Wind's magic chant, Spring's *madhavi* buds fill the fluttering robe of the garden, even at the moment comes the twilight of parting and strews the dust with the withered petals. There is no time here for lament; and so thou makest the *kunda* to blossom in the dewy nights to adorn Autumn's bowl of tear-washed joys. Alas, O heart, at the end of thy day and thy night thou hast to leave all thy little hoard behind thee on the road side.

There is no time here, none at all, O king. That is why you were anxious to beguile Time's heart with beauty. What a garland you have

hung on her neck by arraying formless Death in deathless Beauty!

There is no time here for grieving evermore, and so you have bound fast your unquiet tears in the coils of everlasting silence. The name by which on moonlit nights in silent halls you softly called your beloved, that whispered call you have left here in the ears of eternity. All the sorrows and tenderness of love has blossomed on silent stone in endless flowers of beauty. O Emperor poet, this is the picture of your heart, this is the new *Meghaduta* that rises up in unique song and rhythm towards the Unseen where your sorrowing Beloved is one with the first glimmer of light at Morn, and the tender sigh of earth and sky at the tired end of Day; and with all the ethereal wealth of loveliness of the jessamines on the night of the full moon—on the shores beyond speech from the gates of which the eye comes back again and again like a beggar turned away. Your messenger of beauty eluding all Time's watchers has run on for ages carrying this wordless message: "I have not forgotten, I have not forgotten thee,O my Beloved."

O great king, you are gone for ever, your kingdom has passed like a dream, your throne is in fragments; and of your armies under whose tread the earth used to tremble the memory is blown about in the wind with the dust of *Delhi* streets. The minstrels sing in your praise no more, and the melody of the *Nahabat* mingles no longer with the murmur of the *Jamuna*. The music of the anklets on the feet of fair women has died away in the drone of the cicala in lone corners of your ruined palace and fills with weeping the sky at night.

Yet your messenger, undimmed and unwearied, untouched by the rise and fall of kingdoms and the swell and cease of birth and death, cries out in unvarying tones the words of eternal longing, " I have not forgotten, I have not forgotten thee, O my Beloved."

False words! Who says you have not forgotten, who says you have not opened the door of Memory's cage, that your heart even today is pent up in the eternal night of the Past, that it has not escaped through Oblivion's path of freedom? This tomb stands for ever motionless here in the dust of the world and keeps death tenderly covered in the cloak of Memory. But who can keep Life so? Each star in the sky calls to it, its invitation is to the worlds beyond, to ever new spheres of light. It cuts the knots of Memory and runs out unshackled into the roads of the Universe. O Mighty Emperor, no empire ever could held you, nor all the lands and seas be spacious enough for you. So at the end of life's festival you have spurned the Earth with your feet as if it were an earthen pot. The chariot of your life ever moves forward while your handiwork lags behind, because you are greater far than your own creation.

However far I cast my eye I can see no sign of that traveller. His dearest beloved could not hold him back, his kingdom moved aside to let

him pass, neither sea nor mountain could block his way. His chariot runs on today at the call of the Night to the song of the stars towards the gates of Dawn. It is you who lie here bearing the burden of memory while he, untrammelled, is here no more.

Some Contacts with Rabindranath

DEBENDRA MOHAN BOSE

I had the privilege of seeing Rabindranath at fairly close quarters on many occasions since 1897 when his friendship with my uncle Jagadis Chandra Bose commenced. The exchange of letters which took place between them gives an interesting picture of the many-sided support which Rabindranath gave to Jagadis Chandra, specially during the critical period of the latter's visit to Europe from 1900-1902, when Jagadis Chandra had to struggle hard against adverse conditions to establish his claim as discoverer of a new generalisation in science.

The first occasion when as a grown up student studying in England, I had the opportunity of meeting Rabindranath and having some very stimulating discussions, occurred during his visit to England in 1912. I was present at the dinner arranged by the India Society of London, for introducing Rabindranath to the literary circle of Britain. The Irish poet Yeats presided over the dinner; the address he gave on that occasion appeared later as introduction to the English version of Rabindranath's Gitanjali, which the India Society later brought out. This was the first of many such talks I had with him. Like many other persons I can recall with gratitude his kindliness and accessibility to all and sundry, and his readiness to discuss with each his own particular problem. On such occasions he did not talk to us as a *Guru,* a role he always disclaimed, but as a wayfarer happy to share the fruits of his enlightenment with others.

During the last period of his life Rabindranath became interested in the development of the new theory of matter as being made up of protons and electrons. Reading the books in which Jeans and Eddington popularised the conclusions of this new physics, had led Rabindranath to some original conclusions. These he first gave expression to in his Hibbert Lectures of 1930, delivered in Oxford with the title "Religion of Man". In an appendix to these lectures, the substance is given of a very interesting discussion he had with Einstein. The conclusions which Rabindranath

had arrived at from his readings of the new physics was, that since matter is made up of protons and electrons the scientific picture of matter had no relation with matter as it appears to human perception. Science therefore did not, concluded Rabindranath, deal with absolute truth but with a world of appearance only.

Einstein during his discussion did not agree with this view of Rabindranath. He remarked, "I cannot prove scientifically that truth must be conceived as a truth that is independent of humanity, but I believe in it firmly".

Continuing his study of this new physics, Rabindranath became enamoured with what he calls the new scientific doctrine of illusion or appearance (Baijñānik Māyāvada). After a long and sustained study during which many vocational scientists were consulted, Rabindranath published in 1937 his popular scientific essay "Viswa Parichaya". In course of two years five editions of this book were published, showing the wide appeal which it had made to the reading public of Bengal.

Today I shall confine myself to recounting some of the contacts I had with Rabindranath during 1928-40, the period during which many of the scientists who had contributed to the development of this new physics stayed for some time in Calcutta, and of our attempts, not always successful, to arrange meetings between them and Rabindranath, and of the discussions which these contacts gave rise to.

Many of the physicists about whom I shall have occasion to speak, I met in 1927 during the International Congress of Physics organized on the occasion of the Birth Centenary of the Italian physicist, Volta at Como (Italy). Mussollini was responsible for this large-scale celebration; Einstein alone amongst the leading physicists did not attend the Congress. Amongst those whom I met and who later visited or planned to visit India, I can recall the names of Lord Rutherford, Bohr, Eddington, Jeans, Heisenberg, Sommerfeld and Millikan. The conference was held at the turning point in the development of quantum theory, for whose modern formulation amongst others Bohr, Heisenberg, Sommerfeld were prominent.

Of these the first two to visit India (September 1928) were Heisenberg and Sommerfeld, both of whom stopped a few days in Calcutta on their way to attend another international conference in Physics in Japan. Heisenberg appeared one day without any previous intimation in the University College of Science. Some of us including so far I remember S. K. Mitra, P. N. Ghosh, B. B. Ray and myself arranged a lunch at Firpo's for Heisenberg. Rabindranath was in Calcutta at that time. Heisenberg having expressed a desire to see him, it was arranged that we were to take him the same afternoon to Jorasanko at 4 p.m. As there was some time between the end of the lunch and the time fixed for the visit to Rabindranath, we strolled along the footpaths of the Chowringhee and Chitpore Road, stopping on the way to peep into some interesting places including the

Indian Museum. On arriving at Jorasanko we found that Rathi Babu had arranged a fine tea for us. We left Heisenberg to have him talk with the poet. I do not remember what was the substance of his talk, but Heisenberg was very much impressed by the poet's illuminating personality, which reminded him of a prophet of the old days. Heisenberg then only about 28, was a tall handsome young man of the Nordic type. He belonged to the idealistic youth movement of the first post-war Germany.

After the Como Congress, I met Prof. Sommerfeld again in Munich in the summer of 1928 and arranged his tour programme in India. Acharya Jagadis Chandra with his wife later visited Munich, and came to know Sommerfeld rather closely. It was arranged that after completing his tour programme which included a visit to Megnad Saha at Allahabad, Sommerfeld would spend a few days in Darjeeling with the Boses before starting for Japan. While on his way to Darjeeling, Sommerfeld was telegraphically adivsed to return to Calcutta by an Indian colleague, as a heavy rainstorm was brewing in the Darjeeling area. When I went to receive Sommerfeld at the Darjeeling station he had not arrived. Later I received a letter from him giving the reason for his cancelling his journey. We in Darjeeling were not aware of and did not experience any rainstorm during this period.

As Prof. Sommerfeld had a few days to spare in Calcutta, Prof. P. C. Mahalanobis arranged for his visit to Santiniketan where he spent a whole day with Rabindranath.

In 1930, the poet was starting on his last visit to Europe, which included his engagement at Oxford to deliver his long promised Hibbert Lectures. Subsequently he also met Einstein. While hearing him discuss plans of the coming European tour, I could not help asking him "Sir, why are you anxious to go so often abroad to see new countries and meet new people? One of your great creative periods coincided with your stay in a houseboat on the *Padma*; you did not feel then the need for meeting new people in strange countries?" The poet replied that at that period he was immersed in a world created out of his imagination, and he did not feel the need for the stimulus which contact with the outside world brings. Now he had arrived at a stage of maturity, and his writings had acquired a wider intellectual outlook, he felt the need for meeting people of other mature civilizations. Agreeing with his views I could point to instances of similar transition in the creative efforts of some of the great artists of Europe, like Shakespeare, Goethe, Beethoven, in whom from a lyrical sensuous outpouring of youth a transition took place to a mature balanced intellectual production.

In January 1938, the Silver Jubilee session of the Indian Science Congress took place in Calcutta. The British Association was to be represented by a representative group of Scientists including Lord Rutherford who

was elected to preside over the Silver Jubilee session. At the last moment following the unexpected death of Rutherford on an operating table, Sir James Jeans was elected to replace him. With Jeans came Eddington.

Rabindranath on hearing of their coming was very anxious to meet them. It was their popular exposition of the new physics which had prompted him to write his Viswa Parichaya. He had already a discussion in 1930 with Einstein on his interpretation of the scientific doctrines of the world as appearance and now he wanted to meet Eddington and Jeans. It was arranged by the Science Congress authorities that a party of scientists would visit Santiniketan; the party which went did not include Eddington and Jeans—it was a very unfortunate misunderstanding. Later Rabindranath spoke very feelingly of his intense disappointment; he said that he was preparing to come to Calcutta but he stayed back when he heard of the proposed visit of a party of Science Congress delegates. I have been informed that Rabindranath wrote a letter to Eddington and received a reply from him. It would be interesting to read Eddington's reply if it had been preserved.

Another world famous physicist passed through Calcutta in November 1938, Professor Millikan, whose popular exposition on Cosmic Rays Rabindranath had also read. Millikan with his wife and two assistants landed in Calcutta to make some upper air measurements of Cosmic Ray intensity at three localities in India—Agra, Peshwar and Bangalore. Prof. and Mrs. Millikan were our guests in a Calcutta for a short time. Knowing Rabindranath's interest in cosmic rays I had suggested a visit to Santiniketan. Prof. Millikan regretted very much that his tightly scheduled programme did not permit his breaking the journey at Santiniketan; I learnt later that it was a disappointment to the poet that Millikan could not come to Santiniketan.

On August 7, 1940, a delegation representing the Oxford University visited Santiniketan to confer on Rabindranath the L.L.D. degree (honoris causa). Sir Maurice Gwyer, the then Chief Justice of India and Vice-Chancellor of the Delhi University, presided over the ceremony. Dr. S. Radhakrishnan was a member of the delegation. The whole ceremony was very impressive; only two classical languages, Latin and Sanskrit, were used. Mr. Justice Henderson of the Calcutta High Court gave an oration in Latin as a Public Orator; Rabindranath replied in Sanskrit.

On the evening of August 9, after the invited guests had departed, Rabindranath took his seat on the eastern verandah of Uttarayan. Many people including some guests and senior members of the Visva Bharati sat round him. The talk ranged over various topics, which included a discussion on modern English poetry. Rabindranath turned round to me and enquired about Professor Millikan's visit, and how the Cosmic Ray investigations in the Bose Institute were progressing. After making a suitable

reply I broached before him a subject which since the outbreak of the Second World War had been troubling me for some time; it referred to Hitler's first overwhelming success and the apparently hopeless fight which some of his opponents were putting up. It appeared to me, I said to Rabindranath, that like the Zoroastrians we have to accept the view that in this world Good and Evil represent two opposing principles between whom an eternal conflict was going on. I felt then, and do so even now, that the world would have been a much more degrading place to live in, if in every age there were not some people to take up such apparently hopeless fight for what they believed to be the good. The Victorian doctrine of progress did not represent the real world situation.

Rabindranath in his gentle voice differed from my view. He pointed out how at one time the earth was covered by a mantle of asphyxating vapour including carbon dioxide; gradually part of this gas mantle was replaced by oxygen which made it possible for life to appear. There has been since then, in spite of many set backs, a gradual evolutionary upward development, which for the present has ended with the appearance of man, with his power of speech, capacity for intellectual and artistic creation, and the development of moral and religious ideas.

In September soon after the August 1940 Convocation, Rabindranath came to Calcutta and stayed for a few days in the western room of the Vichitra Bhavan, Jorasanko. He was on his way to Kalimpong to stay with Pratima Devi; Rathi Babu was touring his zemindaries in Rajshahi. On several occasions my wife and myself visited the poet. One day our talk touched on the subject of death and immortality. Rabindranath expressed the view that he could not conceive how his personality which had been so enriched by his varied experience throughout life would be snuffed out with death, and there would be no continuity. I remember reading in Goethe's Conversations, that towards the end of his long and fruitful life he gave expression to a very similar view. These views can occur only to very gifted people looking back in their old age to all the rich experiences which they had garnered in their life's journey.

Wild Swans

(*From Rabindranath Tagore's poem* 'Balaka')

LALITMOHAN CHATTERJEE

Gleaming in lights of eve the winding *Jhelum* stray'd,
— Then dusked like a curv'd sword-blade
That in the sheath you hide;
Day ebb'd: with night's black tide
The stars, like offer'd flowers, floated down the stream :
The dark hill-foot did seem,
With rows of *deodars* pale
Like the slumber-stiff'd speech of the dreaming vale !

Then suddenly heard I
The evening sky
Was swept with flash of sound that pass'd away
Farther and farther off upon its endless way !
— O wild swans !
Drunk with the tempest's madness those your vans
With sound of laughter went
Awakening all the sleeping sky to wonderment !
The sound of your wings' stroke
Like *apsar* maidens broke
The holy meditation of the Brooding Quiet :
A-shiver set
The mountains in the dark that stood :
Shiver'd the *deodar* wood ....

O swans in flight !
To me you've opened what the silence hid to-night :
Under it all I hear,
Far and near,
Sound of quick and quivering wings !
The grass that springs
Flaps its wings in the sod, its sky :
Deep and all unseen where they lie
In sprouts their wings have spread
The seeds in their dark bed :

The earth beneath me reels,
The very woods and hills
Are in flight, passing on and on
From isle to isle, from th' Unknown to the More Unknown! ....

In my heart I seem'd to hear,
With myriad birds in flight
By day and night,
From its nest another Bird had flown
On some quest from shore to shore unknown !
From countless wings this music thrill'd the sphere—
"Not here, not here, elsewhere, some other where !" .....

Urvasi

[*From the original version of Rabindranath Tagore's famous poem*]

LALITMOHAN CHATTERJEE

Nor mother thou, nor daughter, nor art new-wed bride,
O Urvasi, O Nandan's pride !
When tired eve came down in golden garments' fold
Not thou to light the cottage lamp wert ever told ;
Nor — while breast heav'd and lower'd eyes a smile suppress'd —
Were to a bridal bed thy timid steps address'd
At midnight's hushëd rest.
Nay, like the dawn art thou reveal'd
Unshrinking and unveil'd !

O uncaused loveliness, O sweet rootless flower,
When began thy perfect power ?
On what primeval morn didst rise from churnëd main —
Thy right hand nectar held, thy left hand deadly bane ?
The charmëd sea before thee softly broke and fell :
His million-hooded wrath thy loveliness did quell
And bowed to its spell !

Desired of Heaven, flawless fair —
All in thy beauty bare !

Wert thou never bud, a sweet maiden fair and free,
O ever-youthful Urvasi ?
Sole darling of thy dark-roof'd house, didst thou never play
With pearls for toys and with jewels in bright array ?
In what gem-lit chamber, by whose mothering side
Didst sleep on coral bed, lullabied by the tide,
Thy face smile-glorified ?
Nay, to the world thou camest full-grown
In youth and beauty's crown.

From age to age the world's belovëd thou hast been
O Urvasi, O beauty's queen !
For thee the holy saints the fruits of penance yield;
And at thy glance's urge the worlds with youth are thrill'd ;
Thy maddening fragrance far the blinded winds do spread ;
Like bees by honey drawn, poets to thee are led
In singing entrancëd ;
While, with anklets' jingle, skirts' sway, —
Flashing dost turn away !

Before th' assembled gods dancest in ecstasy
O swaying wave, O Urvasi!
In rhythmic swell the deep-sea waters follow thee ;
Earth's golden scarf of corn-crests waving flutters free ;
The falling stars are jewels from thy necklace shed :
In self-forgetful dream the hearts of men are led —
The dancing blood is sped ;
Lo, in the offing bursts thy zone —
Ah, wild in abandon !

Like Dawn on Sunrise Mount all fresh and fair to see,
O world-chanting Urvasi,
The tears of men do wash thy body's comeliness ;
Their red heart-blood doth dye thy twin feet's loveliness ;
Behold those shining limbs thy loosen'd tresses greet ;
The world's impassion'd soul blossoms to hold thy feet —
So light, so flower-sweet !
In ceaseless revels dost thou move
O nymph, O world's dream-love !

Hark, on every side they weep, they weep for thee,
O cruel heedless Urvasi !
Will that primeval age visit the world again ?
With dripping hair wilt thou arise from out the main —
That primal form that rose the primal dawn to greet
To bear the eyes of men alas! too tender-sweet
Weeping them to meet —
While Ocean heaves in music deep
And waves do toss and sweep ?

No more ! O never more ! Thy orb we shall not see
O sunken star, O Urvasi !
So still on earth, e'en on the glad spring breeze's borne,
Whose sigh comes floating, as if lonely Love did mourn ?
When the moon's bright laughter fills north, south, east and west
A strain of memory comes with a strange unrest,
A strain that tears doth wrest.
And still the heart hopes on and sighs
For thee that knowest no ties !

Rabindranath's Mysticism

PARESNATH BHATTACHARYYA

The epithet "mystic" as applied to Rabindranath may be a misnomer. He is, indeed, not a mystic par excellence. The ceaseless flame of mysticism does not consume him as does the mystic. It does not exact Rabindranath's life-long labour like a stern task-master. Yet an under-current of mysticism often breaks out in him into sparks of blinding radiance. Much of his writings is pregnant with a mystical meaning profound enough to find him a place among the first-rate mystic poets of the world. The problem, however, to which of their categories he belongs, is a hard nut to crack. Yet Rabindranath's balance seems to be on the side of a love, beauty and devotional mystic.

Mysticism does not absorb Rabindranath. It does not span the measure of his life. It is not, again, the force motivating all his aspirations and endeavours. The transcendent impulse, which over-reaches the world and seethes the mystic mind with a divine discontent setting at naught the claims of the senses seems to jar upon him. Absorption into an unbroken union with Reality divorced from heart to heart love, sundered from beauty presonified or embodied, is alien to the genius of Rabindranath. Not that no transcendent urge surges in him. Nor, again, that our poet does not dwell in the more real world of the mystic. But it is in the fitness of things that he should not. To be lost or merged in the "Ocean Pacific of God", as Sri Ramakrishna's salt-doll was, is not consonant with the naure of a poet or an artist, for he is the medium through which super-sensuous reality seeks sensuous or imaginal representation. "God with us is not a distant God; He belongs to our homes, as well as to our temples" (Personality).

"Beauty", says Hegel, "is merely the spiritual making itself known sensuously." In 'Pratisṛsti' the poet's vision of the universe is God's through the poet's eyes, and the poet's audition of his songs is God's through the mediation of the poet's ears. Divine creation finds an echo in the poet and this, transfused with divine love, stirs up the poet's songs. The poet's enjoyment of beauty is God's or the King-poet's enjoyment of his own work, focalised through the poet's personality. The poet, therefore, is more conversant with imitations or ectypes than with reality or the eternal archetypes. The Platonic theory tends to degrade art to the fantastic copying of copies. Rabindranath, however, regards artistic creation as real and not as bubbles bereft of content. Art, though a step removed from Reality, is real, for without being diversified into the manifold process of artistic creation, Reality fails to realise itself and becomes an abstract unity

divested of diversity. As Rabindranath says, "And this is Reality, which is truth made our own—truth that has its eternal relation with the Supreme Person" (What is Art?). In one of his exquisite songs the poet chants, "Thus it is that thy joy in me is so full. Thus it is that thou hast come down to me. O thou lord of all heavens, where would be thy love if I were not? Thou hast taken me as thy partner of all this wealth. In my heart is the endless play of thy delight. In my life thy will is ever taking shape. And for this, thou who art the King of kings hast bedecked thyself in beauty to captivate my heart. And for this thy love loses itself in the love of thy lover, and there art thou seen in the perfect union of two" (Gitanjali). "Art", as he further says, "is the response of man's creative soul to the call of the Real" (The Religion of Man). "In Art the person in us is sending its answers to the Supreme Person" (Personality).

To add to the controversy already raised, what is an abiding passion or temperament with the mystic is, with an artist, a passing emotion or more or less a momentary emotional mood. To the extent that this transient state of mind is fashioned into a durable disposition, it exceeds the boundary of poetry or art and culminates into religion or mysticism. The artist may at times cross the boundaries of the "more real world of essential life" in which the "free soul" of the mystic dwells. But this transition occurs in the artist's brief moments of creation. He cannot stay in this transcendent region. The light wings of fancy fail to beat in this immortal sphere. Soon do they droop down palsied to this mortal earth bearing the higher world's tidings. "Visitations from above" are not in the case of the artist the culmination of treading the arduous path of the mystic. Moreover, the artist's scaling of the mystical heights does not revolutionise his life. The mystic's experience brings about a total resetting of his life or a new orientation to Reality. This experience comes as a "figure" focussed on the "ground" of his entire life-history and necessarily fits in with his character. The artist's creative experience, on the other hand, may leave him the ordinary man that he was before. It may fail to effect a redistribution of his life-processes, for it remains more or less a "visitation from above", which, on expiry, leaves behind "a finite clod untroubled by a spark", till another moment of inspiration arrives.

Yet in spite of all that is said against the mystical denomination of Rabindranath, his poetic mysticism defies denial. As Conventry Patmore defines it, "Mysticism is the science of the ultimates, ... the science of self-evident Reality, which cannot be reasoned about." Knight Dunlap describes it as "the belief in a third kind of knowledge other than sensuous perception and intellectual inference." Mystical knowledge, which is the Idea of the Holy, according to Rudolph Otto, is "mysterium tremendum et fascinans". The consensus of psychological opinion holds a belief in the Ultimate Reality and its knowability through some non-rational or supra-

rational faculty to be the two main theses of mysticism. Rabindranath's faith in the Ultimate Reality is, in the first place, unshakeable. Like Otto's "numinous experience" Rabindranath's mystical consciousness is, on the subjective side, "creature feeling"—the emotion of a creature submerged in and overwhelmed by its own nothingness in contrast to that which is supreme above all creatures. On the objective side, this experience relates to the mysterious Reality which is both tremendous and fascinating at the same time. It is not, however, absolutely beyond our apprehension and comprehension, as claimed by Otto. The poet regards it not as something inherently "wholly other", whose kind and character are incommensurable with our own. It is apprehended, though not comprehended. Not reason, but intuition is the faculty adequate to this knowledge. Mysticism as "experience of an immediate or intuitive contact or union of the self with a larger-than-self, be it called the World-Spirit, God, the Absolute or otherwise", finds in Rabindranath an eminent champion. The mystic's "inner light of intuition brings its own certitude and self-sufficiency" needing no rational support whatsoever. "Discursive reason raises the dust of arguments by the storm of words and blinds the investigating intellect", says the poet (Karhi O Komal). "All charms fly at the cold looks of philosophy", as Keats says. The consciousness of Reality is its own evidence. It is self-luminous in character. To stand face to face and commune with Reality, to apprehend it by a decisive glance of intuition without the insertion of logical steps separating the knower from the known, is the modus operandi of Rabindranath as of other great mystics all over the world. "The eyes fail to behold thee, though thou liest in every eye. The heart fails to grasp thee, though thou hidest thyself in every heart", sings the poet. It requires two to allow of the relation between the seer and the seen or the knower and the known. But One and Secondless as Reality is, who would see whom and who would know whom?

Rabindranath's intuition is motivated by love. He regards man as essentially a lover. Love is the faculty of true knowledge, for it feels itself at one with the beloved and overcomes the barriers that separate him from the lover. To put the point in the poet's own language, "His freedom and fulfilment is in love, which is another name for perfect comprehension. By this power of comprehension, this permeation of his being, he is united with the all-pervading Spirit, who is the breath of his soul" (Sādhanā). Our poet does not argue out any philosophy. As a matter of fact, he harbours a strong dislike for speculative philosophy which deals with abstractions and takes us away from concrete reality. This aversion to reason is well expressed in one of his poems where he describes the baby's mind which holds converse with the stars, "a sky, the silly clouds and rainbows" and in which "Reason makes kites of her laws and flies them, and Truth sets Fact free from its fetters" (Crescent Moon). Understanding covers only

a fragment of our soul, while love exhausts it. Thus not understanding but love makes Reality accessible to us. "To understand anything", he says, "is to find something which is our own, and it is the discovery of ourselves outside us which makes us glad". In other words, to understand is to love, which is the highest bliss man can attain to. In the beloved only "we find our own soul in the highest sense" (Sādhanā). Again, "Love carries its own explanation", says Rabindranath (The Religion of An Artist).

In spite of himself the poet tends towards a mystical and for the matter of that an idealistic philosophy. The Reality which haunts and prompts him in his Pilgrim's Progress is the Spirit or Consciousness. He has been "content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity", says W. B. Yeats in his introduction to Rabindranath's English version of Gitanjali. Consciousness lends its hue to emerald and makes it green. It tinges ruby with red. "In his creative activities man makes Nature instinct with his own life and love". (The Religion Of An Artist). Beauty is the lover poet's gift to Nature. Sense-objects serve only to conceal her true character. "Our true habitation and name" are in the more essential world which is above sense. We are no mere playthings of Nature but are the rightful owners of life immortal and bliss ambrosial, for we are the children of God. This subordination of things mundane to the perennial realm of the spirit is the very nerve of idealism. It is not, however, mentalism or subjective idealism that Rabindranath suggests. His idealism is not destructive but affirmative of the finite world of matter, life and mind. This world in its totality is the tabernacle of the living God, severed from which He becomes an empty shadow of Himself. "The Infinite of India", which he calls the Soul of his soul, "was not a thin non-entity devoid of all content" (Sādhanā). The individual is a finite centre of divine manifestation devoid of which God lacks the concrete wealth of His infinitude. God's infinitude lies in His manifestations into the manifold rhythm of matter, life, mind and spirit. He is revealed in Nature apparelled in the golden beauty of the sun, the silvery rays of the moon, the blue firmament bedecked with the stars, the wonderful realm of sound, touch, colour, smell and taste. Everything is the true objectification of the Ideal which is the most real among reals breaking into the perpetual ripples of ever-new creations through the mediation of the recipient poet. Everything is the outflow of divine love which pulsates, throbs and thrills the universe. Reality as apprehended by Rabindranath's intuition of mystical love is a concrete individual, a unity in and through multiplicity, who is inclusive of everything transmuted into a mode of its self-manifestation. It is the ens realissimum, the summum bonum and the conservation of all values. The soul is immortal and it undergoes a cycle of endless birth as a sharer of the joy eternal of the Divine Creator. Suffering is crowned with bliss. "Life is probation and the earth no goal", Rabindranath would say with Browning. Every

stumbling-block is made a stepping-stone to success. Nothing that exists passes out of existence from the ultimate point of view. Whatever vanishes and whatever remains is unchanged, if it is dedicated to God. The poet, for example, prays to God that all the treasures accumulated and yet given up for lost by him may remain conserved at His feet (Naivedya).

Rabindranath views the universe sub specie aeterni or sub specie ideali. Yet he is not a mere idealist. He does not rear an intellectual edifice on speculative or theoretical grounds. His is rather a philosophy of life to mould it therewith. It is not "a diagram of heavens" but "a ladder to the stars" that inspires him. Idealism is a thinking consideration of Reality, while mysticism is a practical orientation to it. Idealism seeks to understand Reality, while mysticism strives to commune with it. The former locates the soul of man in the head, while the latter assigns it to the heart. Idealism leaves its votary cold, mysticism warms him up involving him in its processes. It is not a conceptual construction or an intellectual synthesis that the mystic poet aims at. He inhabits a world of concrete Reality animated by divine contact which transmutes a "finite clod untroubled by a spark" into a participant of divine bliss by whom "God is seen in the star, in the stone, in the flesh, in the soul and clod". This "practising the presence of God" and bringing it to bear upon practical life differentiates Rabindranath from the speculative idealist and aligns his philosophy of life with mysticism.

Rabindranath believes that everything around us beats with the same life as pulsates in us. Yet life is not, according to him, an ultimate reality. He rises above the category of life to that of self-conscious spirit or personality or God from whose point of view death is no less real than life. Vitalism does not satisfy him, for it is like idealism a way of thinking rather than of life. Our poet is smitten with a divine discontent which refuses to be allayed by anything short of the Infinite, for the Infinite alone is bliss. He visualises the universal vital energy that courses in man and the lower animals. But this knowledge is more than theoretical in his case and the vital principle, according to him, though real, is less than Reality. Reality must not be anthropocentric, or judging God from the point of view of man. Mysticism, on the other hand, is the immediate apprehension of God from His point of view. From the finite standpoint diverse phenomena are perceived piecemeal missing the link which enlivens them and renders them intelligible. Rabindranath's world of art, on the other hand, centres round God or the same Reality denominated by him in different ways. "Man is true", he says, "where he feels his infinity, where he is divine, and the divine is the creator in him. Therefore with the attainment of his truth he creates. For he can truly live in his own creation and make out of God's world his own world" (What Is Art?). Thus does the poet proclaim his faith in the ever-lasting yes. He says, "I believe that there is an ideal

hovering over and permeating the earth, an ideal of that Paradise which is not the mere outcome of fancy, but the ultimate reality in which all things dwell and move" (The Religion Of An Artist).

Rabindranath ascends the steep heights of mystical experience and often transports his reader to an ethereal plane "whence speech recoils, as does the intellect, its close associate". The mystic "ineffability" of a tremendous presence which is terrific and fascinating at once maddens him with the melodious music that rings and rolls in the universe. A kingdom of rhythm, all symmetry and resonance, vibrates with joy which is beauty eternal and truth triumphant. The vision of truth, beauty and goodness as the core of Reality welds bewildering diversity into architectonic unity. From the choir of heaven to the furniture of the earth, everything in the mighty frame of the universe pulsates with one "panoramic" music. The poet firmly grasps it through intuitive vision which is as vivid as tactual contact. The greatest leveller of differences, the mightiest dialectic leading to synthesis, is the golden link of love which transmutes everything into a mode of divinity and beautifies even the ugliest object. Love divine destroys even the pangs of death. It is the centre present everywhere radiating into infinite eddies of individuals and particulars. Through it the individual discovers himself in everything and everything in himself. The music of love mellows the world with honey-sweetness. Light, air, the rivulet, all brim with joy. A mellifluent strain wells up from the fount of divine music.

The poet's mystical experience takes the form of melody, rhythm and harmony. He is acutely aware of the music of the soul like Richard Rolle, the father of English Mysticism. For him, as for St. Francis of Assissi, Reality is a "heavenly melody intolerably sweet". Like these mystics, Rabindranath not merely "sees" but also "hears" Reality. In "Dhvani" the poet says, "Born was I with a mind attuned to delicate strings. Sounds from all sides in various vibrations and tunes revolved round the network of my nerves. Messengers of speechless sounds coming from an unknown world surrounded me hour by hour". Reality breathes into his ears "the music of silence" which bursts into the rhythmic utterance of the poet's soul. He listens to the footsteps of his master and hears his speechless music. "Have you not heard his silent steps? He comes, comes, ever comes", sings the poet. His mystical experience takes the form more of voices or auditions than of visions. He cannot, however, for this reason be classed as an "audile", for he is also equally rich in visual and tactual imagery.

That mysticism as ascribed to Rabindranath is not a gratuitous assumption needs more justification. As a matter of fact, the poet himself confesses to a direct contact with Reality which to him is not a speculative abstraction, but a living fact of actual experience. "The Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not merely as a philosophical subject," says he in his preface to "The Religion Of

Man", which, as he continues in the body of the book, "suddenly flashed into my consciousness with a direct vision". A face-to-face acquaintance with Reality is the true touch-stone of a mystic, who abhors learning second-hand. The mystic learns and talks from his own experience with the personal warmth of feeling and emotion. Such is the case with Rabindranath also. All that he speaks about religion as a poet is from vision and not from reason. He cannot philosophically answer ultimate questions relating to evil, death and the like. Yet Reality to him is a fact beyond dispute. As he says, "Yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy" (The Religion Of An Artist). Or, as he puts it in one of his great songs, "My songs touch his feet whom my mind cannot reach". An element of agnosticism seems to lurk in Rabindranath. It is rather realism conscious of the vastness of the infinite as against the smallness of the finite. Reality is apprehended only but not comprehended exhaustively. "We can never be sure," says Rabindranath, "that we have come to know the final character of anything that there is" (The Religion Of An Artist).

"Conversion" or the process of "unselfing" is a stage through which a mystic must pass. This process has been called "an adolescent phenomenon" by Sir Stanley Hall and E. D. Starbuck among others. "The first birth of the individual is into his own little world. Conversion is the individual's Second Birth or spiritual regeneration in which the larger world-consciousness presses in on his consciousness and he emerges from a smaller world of existence into a greater world of being". Rabindranath's "Conversion" or initiation into the mysteries of a larger world-consciousness takes place between the later teens and the early twenties of his adolescent life. This definite turning-point in his life finds expression in several of his adolescent poems. In one of these poems he expresses his refusal to remain confined in the prison of his narrow self, but broadens out to the world outside. This tumultuous self-assertion is not, however, so sudden and unexpected as due to a long process of unconscious incubation. The new view breaks forth into great emotion when the preparation is complete and Rabindranath is ready to be converted. His conversion comes as the climax of a long experience of conflict.

This adolescent crisis is, however, hastened by self-imposed confinement which debars him even from social life at school or college. The intensity of "storm and stress" one day let loose Rabindranath's store of pent-up energy confronting the vast universe. The awakening of his slumbering self occurs after a long spell of torpor. The poet's choked-up spring of personality rises intoxicated with volcanic energy and gushes out to shatter all shackles of restraint. A new world breaks in upon his vision. His inherent largeness is driven home to his consciousness. The call of the

"Ocean Pacific Of God" beckons him to melt his finite being into the Infinite. He must break the fetters of his narrow personality and open it out to the universe. The poet says that he does not know how one day his heart opens in a close embrace with the whole world. All human relations, nay all the links that bind things together, are responded to by his receptive heart which thrills in the fullness of joy. Love's call elicits response in his breast. The sun, the moon, the stars and even the gross elements join in the chorus of love. Everything appears as sweet as honey. An inexhaustible spring of life over-brims him. An emotional expansion and even levitation transmit him to the sky which he animates with his exuberant spirit. He loses the sense of body-weight and is lifted to the sun who garlands him by his rays. Now, again, the poet returns to his physical consciousness and knowing that he is no better than a particle of dust, he pledges fraternity to the universe as a whole.

The mystic's faith in the transcendent Reality is also Rabindranath's. Reality does not exhaust itself in appearance. It is the inexhaustible Infinite which encompasses the universe and yet leaves a remainder like the thousand-headed, thousand-eyed and thousand-legged Purusa of the Purusa-Sukta. Rabindranath is a great contemplative who freely dwells in the realm of Reality breaking all barriers of finitude. Yet static or passive contemplation ill becomes the temperament of the poet. He does not revel in absorbed meditation of the transcendent Reality. As he says in Naivedya, his is not the sitting posture of the yogin with the gate ways of the senses locked up. His is rather the enjoyment of the infinite bliss of emancipation amidst a thousand and one limitations. The mundane life of relativities is not brushed aside by him through the negative or ascetic path of elimination. Purification or consecration in his case consists in a perfect or blessed life in this earthly existence. The "healthy-minded" facing of reality as against escaping it like a "sick-soul" is his mission. His is the path of constant affirmation, the ready acceptance of everything as the gift of divine love turning humiliation to triumph and suffering to happiness.

Mystical experience is "ineffable", for it beggars description. Awe-struck silence, admiration, reverence, love, submission and union compelled by its stupendous vastness and grandeur characterise Rabindranath's experience of transcendent Reality. The poet knows not how his master sings but vainly strives to imitate his music. He is enmeshed in the deliacte network of his song the light of which floods the world. As Rabindranath chants, "I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent amazement. The light of thy music illumines the world. The life-breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on. My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive

in the endless meshes of thy music, my master!" The poet apprehends but does not comprehend the master and is aware of him in the inmost core of his heart where speechless silence prevails.

Thus the poet's mystical experience is also attended with the "noetic quality". He is cognisant of his object as a positive datum of consciousness and as exceeding the bounds of his knowledge at the same time. The certainty of the transcendent presence is bound up with the intuitive certainty of his own self. Amidst all-engulfing darkness it is the self-luminous light, the only indubitable truth. It is the cynosure to guide his voyage in the billowy ocean of life. But it is not wholly known. The King of kings in His court of justice, the Creator in His ceaseless self-creation, are beyond the mystic's natural light of intuition. But even a morsel known is a thing of perfect beauty, truth and goodness and is "a joy for ever". Rabindranath's Lord of the universe is not the quantitative but the qualitative Infinite. He is not the indefinite or a mere summation of finite magnitudes. There is no hiatus dividing Him against Himself. He is a seamless unity each moment of which is qualitatively the same as every other. His manifestations are as much perfect as He is Himself. No addition to or subtraction from Him makes Him more or less than what He is. "All unfinished worship, all unbloomed flowers dropped on the earth, the stream's course choked in desert-beds, things buried in the past or lying ahead in future, are only seemingly lost. Everything remains conserved, ringing silently in the lute-strings of the Musician Divine".

"Transiency", another character of mysticism as pointed out by Prof. William James, also belongs to Rabindranath's mystical experience. It is attended with rhythm, alternation or oscillation between the introvert process of contemplation and extrovert practices like prayer and worship. It suffers from the constant ebb and flow of separation and union, despair and hope, depression and exaltation, darkness and illumination, among other states. Rabindranath's mysticism is no exception to the universal law of terrestrial gravitation. Elevation is only a phase of the rhythmic order of rise and fall. Not unoften does the poet lament that he catches only occasional glimpses and not an unbroken or ever-lasting vision of God. Union is shot through with the pangs of separation. Blessedness and peace immortal are intermittently marred by many a triviality of the mortal clay. The lucid moments of tranquility are interspersed with intervals of chaos and confusion. But this is only one side of the picture, for notwithstanding the transient nature of the poet's mystical experience, the constancy of divine presence runs as its under-current. It strikes a common note amidst the jarring elements of the mystical note. The pervading harmony amidst all discordant states is Rabindranath's still lurking belief in the transcendent presence.

"Passivity", again, characterises the poet's mystical experience. He let

himself go by "keeping silence and letting God work and speak". "Let thy will be done in my life", says he in one of his famous songs. Poetry is not his choice but a necessity laid on him by the master. From the first moment of his conscious life, says the poet, he was given, by which mother he knows not, a toy-flute to play with, harping on which he strayed far away from the work-a-day world. Again, he tells us, he does not know when he set out humming the song of his master, nor does he know when he went out in search of him. A spontaneous urge impelled him, he continues, to tread on the course of life like a stream or fountain. The sentiments of submission or surrender which are primarily a passive response of the mystic soul to the overpowering presence of the Divine, are also eloquently expressed by Rabindranath. "Bend my head low to the dust of thy feet", and the like, are the common refrains of many of the poet's songs. God is the poet of all poets who sings through our poet as His medium. He is the passive recipient and transmitter of the silent music that vibrates in the universe. The songs sung by him, the poet tells us, may be forgotten by the Master, but how can He forget those sung by Him to the poet? Again, he marvels at the wonderful music of the Master whom he listens to with stupefaction. The Divine Musician takes the forcible possession of the poet who suffers himself to be used by Him as His tool or instrument. Like Thompson's Hound Of Heaven, God tracks the poet, who vainly strives to elude Him, but is found out. Rabindranath, as he says, does not seek Him, rather it is He who pursues him and comes uncalled. Again, the poet implores the Master to play upon him the tune which he plays on the morning light and the delightful dialect of the infant. He prays to be made the lyre of God.

Yet "passivity" or "quietude" is only one side of the shield of mystic experience. An over-emphasis laid on this point led James to distort the true meaning of mysticism. The mystic's receptive attitude is passive only from the external point of view. On the other hand, the internal core of this passive state is active in character. Quietism has been violently denounced by Ruysbroeck, for true quiet is essentially active in character. It is a "rest most busy", says Hilton. Von Hugel defines Quiet as the "One Act" —obviously the act of turning the soul towards Reality and the merging of the individual's will in God's, which is immensely active. Rabindranath is not an arm-chair mystic. He not merely professes mysticism in cold blood. He regards the heart or core of personality as the meeting point of God and man. God, according to him, is not a static but a dynamic Being. Meister Ekhert, the dynamic mystic, says, "That must be a vigorous life in which dead things revive, in which even death itself is changed to life. To God naught dies: all things are living in him". Rabindranath's Reality is also dynamic and ceaselessly self-creative. An experience of such Reality, therefore, cannot be purely passive.

"Disinterestedness" is yet another main mark of mystical experience. It arises out of extreme detachment from everything mundane and indifference to the fruits of all actions, or what is called Niskāma Karmayoga. Disinterestedness does not mean lack of all interests, which is another name of passivity or inertia. On the other hand, it means the withdrawal of all interests from finite objects and their concentration or focussing on Reality. Interest divided among many things means the frittering away of energy. Perfection, on the other hand, consists in converting the centrifugal forces into cetripetal ones, rather than destroying them. Rabindranath prays to God for strength of mind so that he can hear divine music in happiness and misery or profit and loss. Equanimity in the face of joy and sorrow or victory and defeat is the touchstone of true mysticism. This balance of mind calls forth all the strength of mind and vigour at the disposal of the mystic. So it ill deserves the epithet 'passive' and 'inert'.

The states of "Purgation", "Self-abnegation", "Purification", "Surrender", "The Dark Night Of The Soul", "Illumination" and "Unitive Vision", among others, mark the mystical experience of Rabindranath. In one of his famous prayer songs he appeals to the Soul of his soul to unfold, cleanse and illumine his heart, to awaken and prompt him to activity, to free him from inertia and doubt, to unite him with his fellow beings and liberate his soul from bondage, to make his mind fixed at the Lord's lotus-feet and crown his life with blessedness. In another, he prays that his egotism may be drowned in tears of devotion, that he may cease advertising himself and remain hidden behind the petals of the Lord's lotus-feet. In still another, he implores that all his love may be diverted to God, all his hopes may reach his ears, his heart may always respond to His call, all ties may be torn by the power of His pull, his beggar's bowl may be emptied of all contents, his heart may be filled with God's gifts in secret and that whatever is beautiful in life may ring in the tune of divine music. "Self-abnegation" or "Surrender", again, is eloquently expressed in many other songs of the poet with similar force. He lays down the burden of his anxious heart at His feet and makes God's will supreme. He beseeches the Poet of poets to strike his garrulousness dumb, to lay hold of his heart-flute and play upon it in high pitch Himself, to make the moon and the planets mute with His tune, to combine at His feet all that lie scattered by the force of His music, so that his life-long expressions may be silent at an instant and he may listen to His flute in endless darkness. Again, the poet wants to efface his mind and the dark shadow of his body, so that God may stand manifest with nothing to hinder His perfection.

Self-mortification of the ascetic mystic seems not to be congenial to the spirit and temper of Rabindranath. Yet the healthy-minded acceptance of evil and suffering as necessary for perfection is characteristic of him. Submission to hardships and trials of life as essential to self-discipline rather

than persecution and torture of the self together with the denial of the common pleasures of life is what the poet cultivates. Periods of doubt, sense of guilt and repentance often make the travails of his mystic path severe. These, undoubtedly, are unconscious processes of mortification though not the deliberately conscious states of a voluntary nature. "My Lord", cries the poet, "my eyes are wide open for thee! I do not see thee and yet do I search thy path with pleasure. Like a beggar do I seek thy mercy seated on the dust of thy door. Not getting mercy, even praying for it feels pleasant! .... Companionless do I want thee .... The earth overbrims with nectarous love moving me to tears. Thy absence causes me pain and yet does it give me delight!" This virile facing of stern reality softens and sweetens it and saves Rabindranath from the pathological masochism of the 'sick soul'.

"The Dark Night Of The Soul", as a precursor of effacement of the self leading to union, also overtakes Rabindranath. "Again do they surround me and veil my eyes", laments the poet. "Various thoughts crowd in me over again and make me wander hither and thither. Burning waxes by degrees and once more do I miss thy feet". Darkness enveloping the soul of the poet is brought out in the song, "Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire! There is the lamp but never a flicker of a flame—is such thy fate, my heart! Ah. death were better by far for thee .... A moment's flash of lightning drags down a deeper gloom on my sight, and my heart gropes for the path to where the music of the night calls me". The same gloomy darkness finds expression in the song, "Clouds heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone?.... On this lonely day it is only for thee that I hope. If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long rainy hours". But states like these seem to be less agonizing than the Dark Night of the mystic's soul. In the case of the poet these states of disharmony and imperfect adaptation to environment do not subdue and demoralise his spirit as they do in the case of many "ship-wrecked souls". These, rather, cause "naughting" of his individual soul leading to his "utter surrender to the great movement of the Absolute Life". The Dark Night is the gateway to a higher state.

"The Dark Night Of The Soul" is preceded by the states of "Illumination", "Rapture", and "Ecstasy". The Beautiful, says the poet, came in the morning with a red parijata in hand. His dream was redolent with its flavour. His gloomy house trembled with joy and his silent lute lying on dust rang unstruck. In one among the poet's innumerable great songs, he wonders as to who graces the temple of his heart with His presence. The night coils her curtain. All gates are flung open, all candles are illumined and all lutes ring their new and ever-new notes. Everything is spontaneity

itself. The poet, in another of his superb songs, marvels at the wonderful mirth of God who, being transfused with the poet's body, mind and heart, bursts into all-illumining lustre and who, through the magic of the poet's sense-organs, conjures up the macrocosm in the microcosm. "Ecstasy", "Rapture" and "Trance" also find magnificent expression through the poet. He sings how he has just enjoyed his union with the Beautiful. His physical frame feels gratified and his heart over-brims with fullness. His fascinated eyes dilate and his breath slows down with divine flavour. His mind is tinged with the hue of divine contact and the nectar of union accumulates in his heart. The poet's self is born anew in the Beautiful even here and now.

"Unitive Vision" in which the finite individual realises himself as at one with the Infinite is eloquently expressed by Rabindranath. In the state of union all is unravelled and the vast ocean of the universe breaks into waves and rocks in joy. Ruysbroeck calls this state the "Ocean Pacific Of God". Our poet, however, does not aspire after liberation from bondage away from this world and so tends to disfavour absorption into the Infinite. "Deliverance is not for me in renunciation", as he sings. He likes to remain a distinct individual holding constant union with the God-head and to taste divine bliss. Proximity to or co-existence, rather than identity with the Infinite, is the poet's aspiration and endeavour. Liberation in the sense of escape from life is discarded by the poet, who as a love and beauty mystic relishes the enjoyment of the infinite manifestations of God split up into thousand rays and colours through the spectral analysis of his senses. So the unitive vision of mystics like Sankara and Spinoza is legitimately outside the purview of Rabindranath's mystical experience. Unity, in his case, leaves room for multiplicity. He does not want to be merged or lost in God. Rather, he strives to maintain some distance from Him, so that he may pray to and worship and commune with Him or stand every day face to face with God with folded hands. "Day after day, Oh Lord of my life, shall I stand before thee face to face", sings the poet. Again, he sings, "I know thee as my God and stand apart". Deification and not identification is Rabindranath's cherished goal of life. God with him is not a lion's den whence travellers never return, but the positively perfect being in whom nothing is lost but everything is conserved in its proper place and function. The finite individual stripped off of all personal distinctions becomes the instrument of divine manifestation. It is transfused with and transmuted by God. In this state "we behold that which we are, and are that which we behold". A duality as distinguished from dualism of the finite soul of the poet and the Infinite Being remains unresolved in Rabindranath. To him "truth is beauty and beauty truth" and "a thing of beauty is a joy for ever". But it takes two to appreciate beauty. As the poet sings, "I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed.

My eyes have seen and my ears have heard". The poet's eyes wander about with content, in the abode of beauty and his ears are merged into the depths of music, as he says. The Lord has placed him in charge of playing the flute in His festival and so does the poet link his weal and woe in songs. If the time is ripe now, he asks his Lord, when he may go in and see His face and offer his silent salutations to Him.

OBITUARY

This year we lost some of our distinguished professors and ex-students. A few pages are offered here to express our heart-felt reverence and gratitude to them all. May their souls rest in peace.

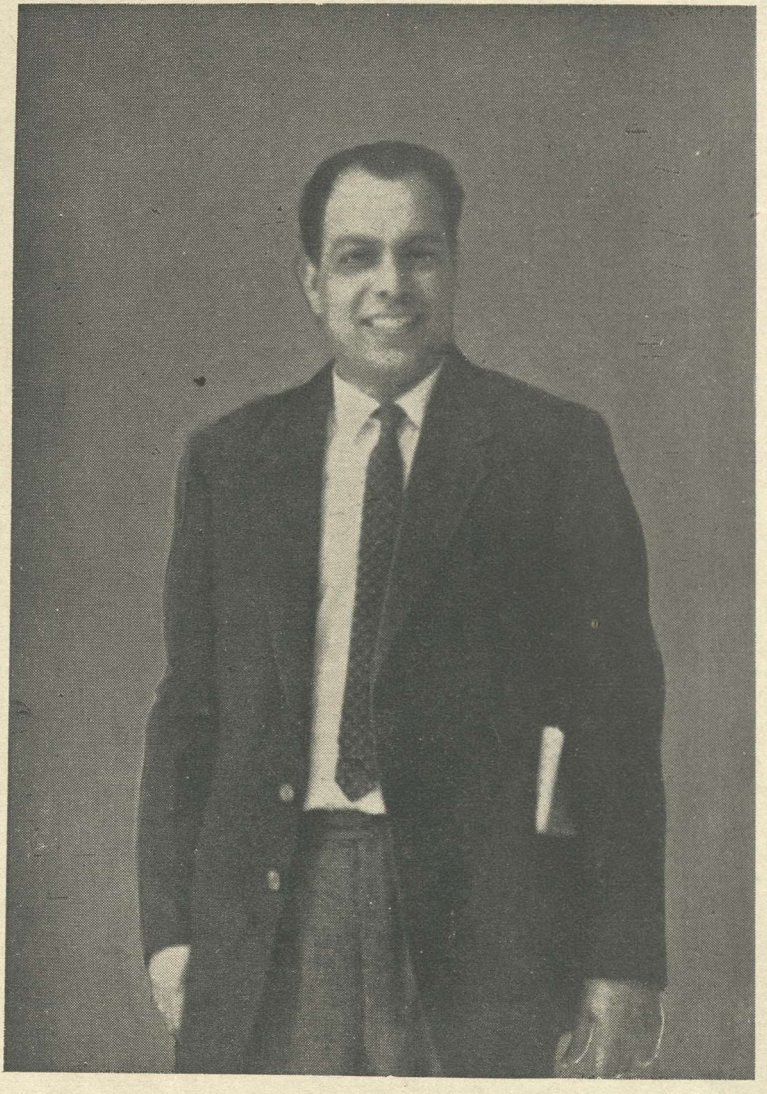

প্রবাসজীবন চৌধুরী

জন্ম—৩রা আগস্ট, ১৯১৭

মৃত্যু—৪ঠা মে, ১৯৬১

Prabasjiban Chaudhury

It was some twenty years ago that I first came to know Prabasjiban Chaudhury as a pupil in the Post-Graduate English classes at the University (he had a triple Master's degree: in Physics, English, and Philosophy—an enviable equipment). I soon sensed his brilliance, and there was something about him that drew me to him. This was the start of a close association unbroken till his death. The last I saw of him was a couple of days or so before the College closed for the summer vacation. We talked for quite some time, and his looks and talk were as radiant as ever. Who could have imagined then that Death was stalking him at that very hour? A week or so later I had been running my eyes one evening over a Bengali newspaper when they came to rest on a sentence that spoke of the University Senate having passed a resolution of condolence on the death of Dr. Prabasjiban Chaudhury, Head of the Department of Philosophy, Presidency College ... After a sleepless night, I picked up that paper over again the next morning to make sure that I had read aright; the grim news was still there in cold, unrelenting print. Few deaths have shocked me more. I was totally unprepared for this sudden extinction of brilliant promise. It was with intense interest that I had been watching his career all these twenty years—his rise to fame as a teacher and philosopher. It seems to be only the other day that he got a first in Philosophy, with specialization in Aesthetics, followed by the Griffith Prize, the Premchand Roychand Studentship, and the D.Phil.; only the other day, too, that he came to see me on the eve of his departure for Shillong to hold his first teaching appointment. From Shillong he went to Mogha; from Mogha to Santiniketan; from Santiniketan he came finally to Presidency College. The day he came to see me after joining his appointment here, eight years back from now, was one of the happiest in my life just as the one I read of his death was one of the darkest. Not even a year is gone since he came back from the U.S.A. where Cornell had invited him as a Visiting Fellow and where he had taken part in undergraduate and post-graduate teaching at the University of Southern California; on his way back he had taken part as a Sectional Vice-President in the International Congress of Aesthetics at Athens. Only a couple of years ago I had the pleasure of reading in an American journal of philosophy an account of contemporary Indian philosophy, in which his work had been especially mentioned and in detail. Not to speak of his books, the tally of his papers alone, published in foreign journals, would constitute a fine record for a young man of 44. No praise could be too high for the pains he

took, which I witnessed with my own eyes, to keep abreast of recent developments in western philosophy, of the study of one of which, the Philosophy of Science, he was a pioneer in this country. Most of the time when he was not teaching he was reading or writing, and in a way he martyred himself to his passion for knowledge. The present year has been a bad year for me so far as my old pupils are concerned. It started with the sudden death of Pratapchandra Sen; then it was Bimalchandra Sinha's turn; and now Prabasjiban Chaudhury; all brilliant young men with whom it had been my good fortune to have come into close contact at one time or another, though the subjects of their specialization were different from mine. And they have all passed away long before their time at the height of their powers. Prabasjiban's sudden and unexpected death, in particular, is an unspeakable tragedy. I do not know what consolation I could give myself or to those more immediately concerned in his death—his aged parents, his wife, his young children.

T. N. S.

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন রংপুরে। তাঁদের আদিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ছোটবিন্যাফৈর গ্রামে। স্বদেশী আন্দোলনে, শিক্ষাসংস্কারে, সাহিত্য-পর্যালোচনায় তাঁর উৎসাহের কথা ভোলবার নয়। ১৯০৫-এর দেশব্যাপী উদ্দীপনার প্রহরেই তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ পর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম-এ পরীক্ষায় তিনি দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। অতঃপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছিলেন অতুলচন্দ্র। প্রথমে রংপুর আদালতে তারপর ১৯১৪ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর ওকালতি শুরু হয়। ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং বছর দশেক সে-কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। এদিকে ১৯১৪-তে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। অতুলচন্দ্রের শ্যালক স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন চৌধুরী মহাশয়ের বন্ধু। সেই সূত্রে অতুলচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর সৌহার্দ্য ঘটে। ১৩৩৩ সালের 'সবুজপত্রে' তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি প্রথম ছাপা হয়। সবুজপত্রে তার আগেই তাঁর অন্য লেখা বেরিয়ে গেছে। সে-পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধের নাম 'অন্নচিন্তা'। তাঁর প্রথম গ্রন্থ —'শিক্ষা ও সভ্যতা'। অতুলচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ যথাক্রমে—'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৩৩৫), 'নদীপথে' (১৩৪৪), 'জমির মালিক' (১৩৫৩) ; 'সমাজ ও বিবাহ' (১৩৫৩), 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৩৬৪)।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসভার তিনি ছিলেন সভাপতি। তাছাড়া এই কলেজের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ব্যাপক যোগের কথা ভোলবার নয়।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। যখন তাঁর বছর দশেক বয়স, সেই সময়ে তাঁকে কলকাতার মেট্রোপলিটন ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় পাস হয়ে ১৯০১-এ তিনি মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এফ-এ এবং তারপর ১৯০৩-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে-সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে চারুচন্দ্রের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পার্সিভ্যাল প্রভৃতি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এ হবার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজেই চারুচন্দ্র তাঁর গবেষণা এবং অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৯৪০ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তিনি সেই তপস্যাতেই ব্রতী ছিলেন।

বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সাহিত্যের অকৃপণ অনুশীলনে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চারুচন্দ্রই তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সে-সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর রচনা পড়ে শুনিয়েছেন। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯২২-এ যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাঁরই হাতে বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের ভার অর্পিত হয়। ১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে সে-বিভাগের উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। শেষ বয়সে তিনি 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। চারুচন্দ্রের কয়েকখানি বই : নব্যবিজ্ঞান (১৩২৫), বাঙালীর খাদ্য (১৩২৬), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৩৪৫), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), তড়িতের অভ্যুত্থান (১৩৫৫), ব্যাধির নিরাময় (১৩৫৬), বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী (১৩৫৬), পদার্থবিদ্যার নবযুগ (১৩৫৬) ইত্যাদি।

বিমলচন্দ্র সিংহ

প্রকৃতির অমোঘ দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে মাটির বুকে ঝরে পড়ে ফুল, রেখে যায় মন-মাতানো সৌরভ। মৃত্যু এসে তেমনি জীবনের রেখা দিয়ে যায় টেনে, পিছনে পড়ে-থাকা কীর্তি মানুষকে রাখে বাঁচিয়ে।

বিমলচন্দ্র সিংহ সম্বন্ধেও এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি কেবল পরিচিত নন, কর্মজীবনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা অস্বীকার করবার নয়। মানুষের কথা তিনি ভেবেছেন, মানুষের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করেছেন। মানুষ কি কখনো তাঁর ঋণ অস্বীকার করতে পারে!

জ্ঞানানুশীলনে ছিল বিমলচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ, সুতীব্র আগ্রহ। এমন আকণ্ঠ তৃষ্ণা, এমন গভীর অনুসন্ধিৎসা না হ'লে কি জ্ঞান আহরণ সম্ভব! আজীবন জ্ঞানচর্চা করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিমলচন্দ্র। চেয়েছিলেন, 'To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought'. অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাঁর স্বপ্ন-সৌধকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল।

দুশ্চর জ্ঞানতপস্যায় কৃতকার্যতা লাভ করলেও বিমলচন্দ্র কিন্তু কেবলমাত্র শুষ্ক অধ্যয়নের মধ্যে আত্মসমাহিত করেন নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। আর সেখানেও তাঁর অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বের কাজ তিনি যোগ্য হাতেই পরিচালনা করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তাঁর রাজনীতি-প্রীতি জ্ঞানান্বেষণের অন্তরায় হ'তে পারে নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মুন্সীয়ানা কোন অংশে ন্যূন নয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে এর প্রথম সূচনা।

বিমলচন্দ্রের বড় পরিচয় কিন্তু একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হিসেবে—আঠারো বছর বয়সে লেখা 'সমাজ ও সাহিত্যে'র মধ্যে এর নির্ভুল নিদর্শন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ প্রতিভা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে দ্বিতীয়রহিত। "সুতরাং সেই প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখাতে হ'লে শুধু নৃত্যনাট্য নয়, শুধু স্তুতি নয়, রবীন্দ্রলেখনী হতে যে ভাবধারা কখনও সুশীতল ঝরনার মত ঝরে পড়েছে, কখনও অগ্নিজ্বালার মত আমাদের অন্যায় আবর্জনাকে ভস্মীভূত করতে চেয়েছে, কখনও দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারকে তীক্ষ্ণ ভাষায় নিন্দিত করেছে, আমাদের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সামনে এনে দিয়েছে, কোনও প্রচলিত ঢেউএ ভেসে যায় নি—আবার সেই সঙ্গে সুরে গানে কবিতায় মনকে মাতিয়ে রেখেছে—সেই ভাবধারার সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকরণ ও কাজে প্রতিফলনই হল রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর মহত্তম উদ্‌যাপন।" সরকারী দপ্তরের প্রয়োজনায় এ ধরণের উৎসব যে সম্পূর্ণ সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না তা উপলব্ধি করতে পেরে

বিমলচন্দ্র জনসাধারণকে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশে 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রসঙ্গে জনসাধারণের কর্তব্য' নামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যে প্রবন্ধ লেখেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন মন্ত্রীর নিকট হ'তে এ ধরণের সংশয়মুক্ত স্পষ্ট অভিমত শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অবিশ্বাস্যও।

বিমলচন্দ্র যা চেয়েছিলেন তাকে কাজে পরিণত করতে পারেন নি, কাল তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকুও। কারণ, কবির কথায় বলি—

'জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।'

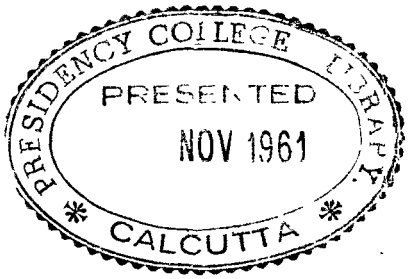

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B.A.
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B.A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20	Mahmood Hasan, B.A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22	Syama Prasad Mookerjee, B.A.
1921-22	Brajakanta Guha, B.A.
1922-23	Uma Prasad Mookerjee
1923-25	Subodh Chandra Sen Gupta, B.A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B.A.
1927-28	Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B.A.
1929-30	Taraknath Sen, B.A.
1930-31	Bhabatosh Datta, B.A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B.A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B.A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B.A.
1934-35	Ardhendu Baksi, B.A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B.A.
1936-37	Asok Mitra, B.A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B.A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B.A.
1940-41	Manilal Banerjee, B.A.
1941-42	Arun Banerjee, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B.A.
1948-49	Subir Kumar Sen, B.A.
1949-50	Dilip Kumar Kar, B.A.
1950-51	Kamal Kumar Ghatak, B.A.
1951-52	Sipra Sarkar, B.A.
1952-53	Arun Kumar Das Gupta, B.A.
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta, B.A.
1954-55	Sukhamoy Chakravarty, B.A.
1955-56	Amiya Kumar Sen, B.A.
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee, B.A.
1957-58	Asoke Sanjay Guha, B.A.
1958-59	Ketaki Kushari, B.A.
1959-60	Gayatri Chakravorty, B.A.
1960-61	Tapan Kumar Chakrabarti, B.A.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti, B.A.
1915-17	Prafulla Kumar Sircar, B.A.
1917-18	Rama Prasad Mukhopadhyay, B.A.
1918-19	Mahmood Hasan, B.A.
1919-20	Paran Chandra Gangooli, B.A.
1920-21	Syama Prasad Mookerjee
1921-22	Bimal Kumar Bhattacharyya
1921-22	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Akshay Kumar Sircar
1923-24	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Bijoy Lal Lahiri
1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Sunit Kumar Indra
1928-29	Syed Mahbub Murshed
1929-31	Ajit Nath Roy
1931-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Provat Kumar Sircar
1936-37	Arun Kumar Chandra
1937-38	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	Bimal Chandra Datta, B.A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B.A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibanlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindramohan Chakravarty
1950-51	Manas Mukutmani
1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhury
1953-54	Pradip Kumar Das
1954-55	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Devendra Nath Bannerjee
1956-57	Subal Das Gupta
1957-58	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Rupendu Majumdar
1960-61	Ashim Chatterjee